বিমল মিত্র

মিথুন লগ্ন

বিমল মিত্র

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

নিবেদন

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মিথুন লগ্ন' একটি চিরস্মরণীয় উপন্যাস। আগে এখনকার মতো পত্রপত্রিকায় শারদীয় বিশেষ সংখ্যায় 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' প্রকাশ করবার রীতি ছিল না। আজ থেকে চার দশক আগে একটি পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় এটি 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পর এত আলোড়ন সৃষ্টি হয় যে তারপর থেকে প্রত্যেক পত্র-পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সাত-আটটি করে 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' প্রকাশিত করার জন্যে প্রতিযোগিতার যুগ আরম্ভ হয়ে যায়। এক কথায় 'মিথুন লগ্ন' উপন্যাসটি সেদিক থেকে বর্তমানের 'সম্পূর্ণ উপন্যাসবলী'র জনক হিসেবে গণ্য করা যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে বিগত 'পাঁচ-ছ' বছর ধরে এই উপন্যাসটির মালয়ালম সংস্করণ কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাসের পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসছে।

প্রকাশক

এ-কাহিনী এক'শ দু'শ কিংবা তিন'শ বছর আগের নয়। এ নিতান্তই আজকের দিনের কাহিনী।

কিন্তু তিন'শ বছর আগেও এখানে একদিন এমনি ভিড় জমেছিল। দিল্লীর মসনদে তখন সাহ্‌জাহানের রাজত্ব। সাহ্‌জাহানের হুকুমে কাশিম খাঁ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে হুড়মুড় করে পড়লো একদিন এই হুগলিতে। শহর ভাঙলো, শহরের কোঠা-দালান ভাঙলো, মন্দির ভাঙলো, গীর্জা ভাঙলো। লোক-লস্কর, সেপাই-সান্ত্রী, মেয়ে-পুরুষ কিছুই আর বাদ গেল না। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল গঙ্গার ধারে দা-ক্রুজ্‌ সাহেবের এই পর্তুগীজ গীর্জা। সমস্ত রাত সেদিন ঝড়-জল-বৃষ্টি গিয়েছে। হঠাৎ সকাল বেলা দেখতে দেখতে ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেল। হুগলীর লোক অবাক হয়ে দেখলে নদীর মধ্যেখানটা আলোয় আলো হয়ে উঠেছে আর দা-ক্রুজ্‌ সাহেব সেই গঙ্গার মধ্যে থেকে উঠে আসছে দু'হাত উঁচু করে। হাতে তার পাথরের মূর্তি। ভার্জিন মেরীর মূর্তি।

লোকে হরিবোল দিয়ে উঠলো। বললে—গুরু-মা উঠেছে আমাদের—গুরু-মা উঠেছে—

ভার্জিন মেরীকে ওরা বলতো গুরু-মা।

তা সেদিনের মতো আজও তেমনি ভিড় এখানে।

গীর্জা এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে। শ্যাওলা জমেছে দেয়ালের গায়ে। গাছগুলো বুড়ো হয়ে গিয়েছে। নিয়ম করে পরিষ্কার করা হয় না আর আগেকার মতো। ব্যাণ্ডেলের লোক এদিকে বড় একটা বেড়াতে আসে না বটে। কিন্তু আজ এসেছে। এখানে আজ ভিড় জমেছে অন্য কারণে। বাগানের একপাশে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠবার জায়গা। আর তার ওপরে একটা চাতাল। সেই চাতালের ওপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে একটি মহিলা।

লোকে জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে গো এখানে? ভিড় কেন?

একজন বলে—কে নাকি একজন মরে পড়ে আছে শুনছি—

—কে মরেছে?

—কে জানে বাছা, মরবার আর জায়গা পেলে না, শেষকালে মরতে এল এই গীর্জেতে!

কিন্তু মন্দিরের দেবতাকে দর্শন করতে হলে যেমন প্রথম ধাপ থেকে এক দুই করে সিঁড়ি ভাঙতে হয়, শিল্পের দেবতার বেলায় তো আর সে নিয়ম নেই। বলতে গেলে কোনও নিয়ম-কানুনই নেই। তুমি মাঝপথ থেকেও আরম্ভ করতে পারো, আবার শেষ থেকেও করতে পারো। শিল্পের দেবতা বলে—আরম্ভের আগেও যেমন শুরু আছে শেষের পরেও তেমনি আছে শেষ। অর্থাৎ আরম্ভটাও আরম্ভ নয়, শেষটাও শেষ নয়—শুধু মাঝখানের এই জীবনটাই এক মহা শিল্পকর্ম। এই জীবন-শিল্প নিয়েই আমাদের এ-গল্প।

খাতার প্রথম পাতায় গল্পের নামটি লিখে সবেমাত্র লিখতে শুরু করবো, এক বন্ধু দেখে বললে—এত নাম থাকতে এই নাম দিলে শেষকালে?

বললাম—আমার গল্পের কেন্দ্রই যে একটি মেয়ে আর একটি ছেলে।

—তা হোক, তোমার অনেক গল্পই তো কতরকম দিদি নিয়ে—পুতুলদিদি, সোনাদিদি, মিষ্টিদিদি, কালোজামদিদি—সেই রকম একটা নাম দিলেই পারতে আর তা ছাড়া এ-গল্পের নামটাও যে দুর্বোধ্য।

বললাম—যাকে নিয়ে আমার গল্প—তার জন্মই যে মিথুন লগ্নে—আর তা ছাড়া তার নামটাও যে তত ভালো নয়, অন্তত গল্পের মাথায় দেবার মতো নাম তার নয়—নিতান্ত আটপৌরে, ঘরোয়া মেয়ে সে। মিলের মোটা শাড়ি পরে, চোখে মোটা চশমা, লেখাপড়া নিয়েই কাটায়,

পুরুষের সঙ্গে তার কোনো সংস্রবই নেই। এমন মেয়ের নাম যদি সুধন্যা কি উদিচি দিতাম—সেইটে কি ভালো হতো? তার চেয়ে তার আসল নাম যা তাই দেওয়াই তো ভালো।

বন্ধু জিজ্ঞেস করলে,—আসল নামটা কী?

বললাম—কমলা।

বন্ধু বললে—ওই আমাদের সুধীরবাবুর মেয়ে?

বললাম—না।

—তবে কি আমাদের সঙ্গে পড়তো কমলা বোস, সে-ই?

—না, সে-ও নয়, তুমি এ-কমলাকে চিনবে না, আমিও কমলা দত্তকে চিনি না—এ আমার শোনা গল্প, সে যেমন-যেমন বলেছে আসলে আমি তেমন-তেমন লিখবো, আমি এতটুকু বাড়াবোও না, কমাবোও না—সত্যিই বাড়ানো-কামনোর মতো গল্প কমলার জীবনে তো নেই। কমলা দত্তর জীবনে কোনও নাটকই নেই। এককথায় কমলা দত্তকে নিয়ে কোনও গল্পই হয় না। হুগলী গার্লস ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস কমলা দত্ত এম-এ, বি-টি-র নিজেরই ধারণা ছিল না যে, কোনও দিন আদিনাথের বন্ধু এই আমিই তাকে নিয়ে আবার গল্প লিখবো। সে-ধারণা থাকলে অন্তত কমলা দত্তর মতো মেয়ে আদিনাথকে এত কথা বলতো না। যে-মেয়ে হাঁটলে-পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত দেখা যায় না, যে-মেয়ে ভুলেও কখনও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একটু তরল হয়নি, যে-মেয়ে এই যুগেও নিজের নাম লেখে 'কমলাবালা দত্ত', তাকে নিয়ে গল্প লিখেছি জানতে পারলে হয় তো ঘেন্নায় আত্মহত্যাই করবে সে। কিন্তু না, আদিনাথকে আমি কথা দিয়েছিলাম যেমন-যেমন করে সে বলেছে আমাকে, তেমনি করেই আমি লিখবো, তেমনি করেই আঁকবো তার চরিত্র। এতটুকু নড়চড় হবে না। এতটুকু বাড়াতেও পারবো না, কমাতেও পারবো না এ-গল্প। কমলা দত্ত না হয় এখন বোধশক্তির বাইরে, কিন্তু আদিনাথ তো আছে, সুকুমারী তো আছে। সুকুমারী বসু। আর সেই রামমোহন সেন। হুগলী গার্লস স্কুলের সেক্রেটারি। স্কুল উঠে গেলে কী হবে, স্কুলের সেক্রেটারি তো এখনও সশরীরে বেঁচে!

কিন্তু আসল পালা আরম্ভ করার আগে আরো একটু গৌরচন্দ্রিকা আছে, সেইটে করে নিই।

বহুদিন বিদেশে ছিলাম। বিদেশে থাকবার সময় কলকাতার বন্ধু-বান্ধব, সংসার, সমাজ, সাহিত্য সব ভুলেই ছিলাম একেবারে। আমি যে এককালে গল্প লিখতাম, কিম্বা এককালে আবার লিখবো এ-সব কথা কখনও মনে উদয় হয়নি। এ-কাহিনী আমি আমার সোনাদি'র কথা বলতে গিয়ে বলেছি, সুতরাং এখানে তা না বললেও চলবে।

যা হোক, বহুদিন পরে যখন কলকাতায় ফিরে এলাম তখন দেখলাম এখানে সব আমূল বদলে গিয়েছে। যে বন্ধু বেকার ছিল সে চাকরি পেয়েছে, যে কাপড় ধুতি পরতো সে স্যুট ধরেছে। যে গরীব ছিল সে বড়লোক হয়েছে, যে কুমার ছিল সে বিয়ে করে ফেলেছে। আর সকলের চেয়ে বেশি এলাহি কাণ্ড করে বসেছে আদিনাথ। আমাদের পুরনো বন্ধু, বয়স্য, আড্ডাবাজ আদিনাথ।

আদিনাথ বিয়ে করেছে বটে কিন্তু সচরাচর যেমন বিয়ে লোকে করে তেমন বিয়ে নয়। পাঁচ-ছ'টি মেয়ের সঙ্গে আদিনাথের সম্পর্ক ছিল জানতাম। এবং পাঁচজনকেই বিয়ে করবে বলে আদিনাথ প্রতিজ্ঞা করেছিল তাও জানতাম। কিন্তু রমা নয়, রমলা নয়, সুতপা নয়, সুপ্রীতি নয়—যার সঙ্গে বিয়ে হবে না বলেই জানতাম সেই সুকুমারীকেই বিয়ে করে বসে আছে আদিনাথ!

দেখা হতেই ধরলাম। বললাম—শেষপর্যন্ত সুকুমারীকেই বিয়ে করলি?

আদিনাথ বললে—হ্যাঁ, সুকুমারীকেই বিয়ে করলাম, চার-পাঁচটি ছেলেমেয়েও হয়ে গিয়েছে আমার। সবাই আমাকে তোর মতন এই প্রশ্নই করে। কিন্তু আসল কারণটা কেউ জানে না—

বললাম—সুকুমারীকেই শেষ পর্যন্ত তোর পছন্দ হলো?

আদিনাথ বললে—অন্য সকলকে আমি অবশ্য সেই উত্তরই দিয়েছি—

কিন্তু আসল কারণটা আলাদা, সেটা কেউই জানে না, জানে শুধু সুকুমারী আর জানি আমি—আসল কারণটা আলাদা—

বললাম—আসল কারণটা কী শুনি ?

আদিনাথ বললে—আসল কারণটা হলো কমলা দত্ত—

—কমলা দত্ত ? সে আবার কে ?

আদিনাথ বললে—কমলা দত্ত হুগলী গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস—

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তুই থাকিস টালিগঞ্জে, আর সেই কোথায় হুগলী, তার সঙ্গে তোর সম্পর্ক হলো কী করে ?

আদিনাথ বললে—সে অনেক কথা, একদিন সব বলবো তোকে, যা কাউকেও বলিনি—তোরা গল্প লিখিস, আমার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারবি, জানিস তো আমি বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করেছি, সুকুমারীও খুব খুশি হবে তুই গেলে—ও-ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে—

—চাকরি ? কোথাকার ?

—ওই হুগলী গার্লস ইস্কুলের চাকরি—কমলা দত্তর ইস্কুলেই সুকুমারী চাকরি করতো কিনা।

আদিনাথের মুখে যেদিন কমলা দত্তর গল্পটা শুনি তারপর কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। এতদিন যে লিখিনি তারও একটা কারণ আছে—প্রেমের গল্প লিখতে একটু ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে কমলা দত্তর প্রেম। যে-প্রেম কাছে টানে কিম্বা দূরে ঠেলে, সে তো সহজ প্রেম। যে-প্রেম সৃষ্টি করে না, শুধু ধ্বংস করতেই জানে সে-ও সহজ প্রেম। কিন্তু যে-প্রেম কাছেও টানে না দূরেও ঠেলে না, সৃষ্টিও করে না, ধ্বংসও করে না, শুধু দুর্বার গতিতে অমোঘ অমঙ্গলের দিকে অনিবার্যভাবে প্রসারিত হয়, মৃত্যুও নয় জীবনও নয়, জীবন্মৃত এক ভয়াবহ অস্তিত্বে পরিসমাপ্তি হয়—সে প্রেমকে কী প্রেম বলবো!

আজো চোখ বুজলে দেখতে পাই ব্যাণ্ডেল স্টেশনে নেমে আদিনাথের সেই মাইলখানেক ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যাওয়া। খাস কলকাতার মেয়ে সুকুমারী সপ্তাহের ছ'টা দিন প্রায় বন্দীই হয়ে থাকতো ইস্কুলের বোর্ডিং-এ। ঠিক শনিবার বিকেল হতে-না-হতে গিয়ে হাজির হতো আদিনাথ। আরো দেখতে পাই, ব্যাণ্ডেল স্টেশনের বাঁ-দিকে প্ল্যাটফরম পেরিয়েই রাস্তার ওপর একটা মস্ত বড় অশথ গাছ, তারই তলায় গোটা দুই-তিন থার্ড ক্লাস বাক্স ঘোড়ার গাড়ি। আর সকলের চেয়ে স্পষ্ট দেখতে পাই—সেই তিন'শ বছর আগেকার সেই ব্যাণ্ডেল গীর্জা। সেই ভার্জিন মেরী! আর বাগানের কোণে সেই শ্যাওলাধরা উঁচু সিঁড়িগুলো—আর তার ওপরের সেই নিরিবিলি চাতাল—সেটাকে ঘিরে কমলা দত্ত, আদিনাথ, সুকুমারী আর রামমোহন সেন-এর জটিল প্রেম এক অমোঘ অনিবার্যতায় পরিণতি লাভ করেছিল!

সহিসরাও চিনে গিয়েছিল আদিনাথকে। প্রত্যেক শনিবার দিন এই বাবু দুটো দশের লোকালে এসে নামে, তারপর ঘণ্টাখানেক বাদে আবার ফেরে। ফেরে মেয়ে-স্কুলের এক দিদিমণিকে নিয়ে। গাড়ির দরজা-জানালা ঘুলঘুলি সব বন্ধ করে গল্প করতে করতে আসে ভেতরে। ওপর থেকে সহিসরা দু'জনের গলার শব্দটাই শুধু শুনতে পায়। কথা বুঝতেও পারে না, বুঝতে চেষ্টাও করে না। তারপর চারটের সময় কলকাতার লোক্যালটা ধরিয়ে দিয়েই তাদের ছুটি। যাতায়াত দেড়-টাকা ভাড়া। পাঞ্জাবি-পরা বাবুটি পকেট থেকে ব্যাগ বার করে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি টিকিট কিনতে স্টেশনে চলে যায়। এমনি চলেছে বছরখানেক কি বছর দেড়েক। বিশ্বাসী বাবু, টাকাটা বাজিয়ে নেবারও দরকার হয় না। এত চেনা লোককেও কি অবিশ্বাস করতে হবে নাকি!

হুগলী মেয়ে-ইস্কুলের নামডাক আছে এ-দিকে। বাপ-মায়েরা এখানে মেয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। দিদিমণিরা সবাই ভদ্দরঘরের মেয়ে; লেখাপড়া জানা লোক।

বলে—বড়দিদিমণির ভরসাতেই দেওয়া—নইলে আর কি।

মেয়েরা ইস্কুলে ইংরিজি শিখবে, অঙ্ক শিখবে, সেলাই শিখবে, তবু মেমসাহেব হবে না, গুরুজনকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে। গেরস্থের মেয়েদের আর কি চাই। যতদিন ইস্কুলে পড়বে ততদিন ভদ্র আচার-ব্যবহার, হিসেবপত্তোর. সেলাই-ফোঁড়া, ইংরিজী চিঠিপত্র লিখতে পড়তে শেখা— এই সব। তারপর কারো বিয়ে হবে সালকে, কারো বরানগর, কারো উত্তরপাড়ায়, কারো নিকাশিগঞ্জে, কারো বা দৈবাৎ কলকাতায়। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কেউ যেন না বলে— নিরেট গোমুখ্যু বউ। গাল শুনতে হবে তো বাপ-মাকেই। শ্বশুর-শাশুড়ী বলবে— এমন বাপ-মা যে, একটু লেখাপড়া পর্যন্ত শেখায়নি গো।

এ-সব অনেকদিন আগের কথা। তখন সুকুমারীও এ-ইস্কুলে চাকরি করতে আসেনি। আদিনাথও শনিবার-শনিবার হপ্তা-ডিউটি দিতে আসতো না। টিম্ টিম্ করে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতো ইস্কুলের আদি আর অকৃত্রিম সেক্রেটারি রামমোহন সেন—য়্যাড্‌ভোকেট। পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোকের মেয়ে নিয়ে তিনি ইস্কুল করেছিলেন একদিন উদ্দেশ্যহীন খেয়ালের বশে। একটা কিছু সমাজ-হিতকর, যে-কাজ করলে দশজনে ভালো বলবে। পৈতৃক টাকা ছিল প্রচুর। জমি-জমা, লাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর, কোম্পানীর কাগজ আরো কত কি! শখ করে য়্যাড্‌ভোকেট হয়েছিলেন, না হলে খারাপ দেখায় বলে। না হলে দু'বার এম-এ. পাশ করে বাড়িতে বসে থাকলেই পারতেন। কেউ কিছু বলতো না। কিন্তু আবার আইন পাশ করলেন, য়্যাড্‌ভোকেট হলেন। বললেন—আইন জেনে রাখা ভালো—নিজের না হোক পরেরও তো উপকারে লাগতে পারে।

তা পরোপকারী লোক বটে রামমোহন সেনমশাই।

লোকটা যে পরোপকারী সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। কিসের দায় পড়েছিল তার ইস্কুল করবার। আর এই মেয়ে-ইস্কুল। মাইনে তো নামমাত্র। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে বড় কড়া। দেখে দেখে বেছে বেছে টীচার রেখেছেন। সাজগোজ করা চলবে না। ক্লাশে পান খেতে খেতে পড়াতে পারবে না। গয়না-গাঁটি পরতে পারবে না গা মুড়ে।

গয়না তোমার থাকে থাক, বাইরে কলকাতায় গিয়ে পরো। ছাত্রীদের চোখের বাইরে। নইলে ওই সব দেখবে আর শিখবে কেবল। টীচারদের দেখেই তো শেখে তারা।

আদিনাথ প্রথম এসেই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

সুকুমারীর চিঠি পেয়েই তো যাওয়া। লিখেছিল—ব্যাণ্ডেল স্টেশনে নেমে অশ্বত্থ গাছতলা থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসবে, নইলে ইস্কুলের বোর্ডিং থেকে আমাদের হেঁটে স্টেশনে যাওয়ার নিয়ম নেই এখানে, সেক্রেটারির বারণ আছে। ভারি স্ট্রিক্ট্ লোক কিনা।···আমার ছুটোর সময় ছুটি। আমাদের হেড মিস্ট্রেস কমলা দত্ত, কমলাদি'র সঙ্গে দেখা করে আমার নামে স্লিপ পাঠালেই আমি চলে আসবো—বেশি দেরি করো না কিন্তু—

আদিনাথ বললে—সুকুমারীকে তো চিনিস তোরা, প্রথমে অতো দূরে চাকরিই নিতে চায়নি। আমার সঙ্গে ঘন-ঘন দেখা হবে না বলে প্রথমে আপত্তিই করেছিল—

বললে—তুমি কথা দাও—শনিবার-শনিবার যাবে ঠিক?

সুকুমারী সেই আদিযুগের মেয়েমানুষ। আদিনাথ, সুকুমারী বা আমরা যে যুগে জন্মেছি তখন মেয়েমানুষের চাকরি করা দূরে থাক, রাস্তায় বেরোনোই ছিল অপরাধ। বাড়ির মেয়েদের নিয়ে থিয়েটার দেখতে গেলে ঘোড়ার গাড়ির জানালা-খড়খড়ি এঁটে বন্ধ করে যেতে হতো। কিন্তু সুকুমারীকে সেই যুগে জন্মেও যে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল সে কেবল বাধ্য হয়েই। আমাদের সকলের বন্ধু তপনের পিসতুতো বোন সুকুমারী। পরের বাড়ি গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে যা হোক কিছু করা ভালো। এই হিসেবেই চাকরি করা। কিন্তু কখন কোন্ ফাঁকে আদিনাথ যে সুকুমারীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ফেলেছে, আড়ালে আবডালে দেখা-সাক্ষাৎ করে,—সে-খবর প্রথমে আমরা জানতেই পারিনি। যখন জানতে পারলাম, তখন সম্পর্কের জাল অনেক দূর গড়িয়েছে।

তপন হাসতো, বলতো—আদিনাথ ক'টাকে সামলাবে—

আমরা জানতাম সুকুমারীর ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে। সুকুমারীর

না-আছে রূপ না-আছে টাকা। অন্যদিকে আর সবাই যারা ছিল তাদের কাছে সুকুমারী হেরে যেতে বাধ্য। রমার বাবার গাড়ি ছিল। রমলার দাদা মস্ত বড় চাকরি করতো, সুতপার আর কিছু না থাক রূপ ছিল নিজের। সুপ্রীতির গান ছিল শোনবার মতো। এতগুলোর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসার ক্ষমতা আর যারই থাক সুকুমারীর ছিল না।

আদিনাথ বললে—কিন্তু সেই সুকুমারীরই তো জিত হলো শেষ পর্যন্ত—

সত্যিই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—সেইটেই তো জানতে চাই—কী করে জিত হলো সুকুমারীর?

আদিনাথ বললে—কারণ সুকুমারী মেয়েমানুষ বলে—

মেয়েমানুষ! আরো অবাক হয়ে গেলাম।

আদিনাথ বললে—এ-কথা আর কাউকে বলিনি আজ পর্যন্ত। রমা, রমলা, সুতপা, সুপ্রীতি হয়তো সুকুমারীর চেয়ে বেশি রূপসী, বেশি গুণী—রমা সত্যিই বড়লোকের মেয়ে, ওকে বিয়ে করলে হয়তো খাওয়া-পরার অভাব হতো না কোনওদিন। রমলা দাদাকে বলে হয়তো আমার একটা ভালো চাকরিও করে দিতে পারতো, সুতপা সত্যিই সুন্দরী সন্দেহ নেই, পাশে নিয়ে ঘুরলে দশজন চেয়ে দেখতো, আর সুপ্রীতির মতো গানের গলা ক'জনের আছে! সব স্বীকার করি, কিন্তু আমি তো তাদের নিয়ে সভায় যাচ্ছি না—আমায় যে বউ নিয়ে ঘর করতে হবে রে—

বললাম—ঘর কি আর কেউ করছে না?

—না, কেউ ঘর করছে না, ক'জন ঘর করছে শুনি? ভালো করে খবর নিয়ে দেখ, সব সংসারে ভাবের ঘরে চুরি চলছে, যারা সত্যিই ঘর করছে, জানবি তাদের বউরা সবাই মেয়েমানুষ!

মেয়েমানুষ! তার মানে?

আদিনাথ বললে—কমলা দত্ত, যার চরিত্র খাঁটি সোনার মতো পবিত্র, যার ইস্কুলে মেয়ে দিলে সতী-সাবিত্রী হয়ে যাবার আশা থাকে, যার পায়ের গোড়ালি একমাত্র আমি ছাড়া বোধ হয় আর কেউ দেখেনি,

অন্য টীচারদের যে মায়ের মতো স্নেহ করে, বোনের মতো ভালোবাসে, স্বামী বিবেকানন্দর ছবিতে প্রণাম করে যে দিনের কাজ শুরু করে, ইস্কুলের ঝি, ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান যার নাম করতে পর্যন্ত অজ্ঞান—সেই কমলা দত্ত লক্ষ্মী গার্লস ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস কমলা দত্ত পর্যন্ত মেয়েমানুষ নয়।

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—তার মানে ?

আদিনাথ বললে—যখন আমার বিয়ে হবার মাত্র তিন মাস পরে ছেলে হলো, সবাই নানা কথা বললে। কেউ বললে আমি চরিত্রহীন, কেউ বললে লম্পট, কেউ বললে ডুবে ডুবে জল খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছি, শেষে নিজের বাড়ি থেকেই তো আমাকে সরে আসতে হলো—কিন্তু মুখে আমি কিছুই বললাম না—আজো বলি না—বললে কেউই বুঝবে না। তবে তোকে বলবো। তুই মানুষের মন নিয়ে কারবার করিস, তুই হয়তো বুঝতে পারবি—

বললাম—বল্—

আদিনাথ বললে—ওই রমা, কমলা বা সুতপা ওদের বিশেষ কেয়ার করতো না সুকুমারী। কোনোদিন ওদের জন্যে কোনও ভয়ও ছিল না সুকুমারীর মনে।

সুকুমারী বলতো—লোকে বলে তুমি নাকি ওদের কাছেই বেশি সময় কাটাও, বলে—ওদেরই কাউকে নাকি তুমি বিয়ে করবে আমাকে ফেলে—

আমি বলতাম—লোকে যা বলে বলুক—তুমি কী বলো ?

—আমি হাসি—

—কেন, হাসো কেন ?

সুকুমারীর সঙ্গে হয়তো কোনও হোটেলে বসে আমি তখন গল্প করছি। শনিবার দিন তো ট্রেনে চড়ে আসতাম কলকাতায়। এসে কোনও-দিন সিনেমায়, কোনওদিন রেস্টুরেন্টে, কোনওদিন ইডেন গার্ডেনে বসে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে আবার শেষ লোক্যালে পৌঁছে দিয়ে আসতাম ওর

বোর্ডিং-এ। তারপর আবার ফিরতাম কলকাতার গাড়িতে। ফাঁকা গাড়ি, তখন অতো রাত্রে ফেরবার সময় গাড়িতে কেউ থাকতো না। সুকুমারীর কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আসতাম। আশ্চর্য, মনে হতো—সকলের চেয়ে মানমর্যাদায় ছোট হয়েও এমন আত্মবিশ্বাস ওর হলো কেমন করে!

সুকুমারী বলতো—নিজের ওপর যদি আমার সে বিশ্বাসটুকুই না থাকবে তো তোমার সঙ্গে মিশি কেন? সংসারে আমার কেউ নেই, আমি আত্মীয়-কুটুমের বাড়িতে গলগ্রহ—। গরমের ছুটির সময় মামার বাড়িতে গিয়ে রোজ আমায় সংসারের ভাত রাঁধতে হয়। তোমার সঙ্গে দেখা করবার সময়টুকু পর্যন্ত পাইনে—এসব জেনেও তো তোমার সঙ্গে বছরের পর বছর মিশেছি—তোমাকেও মিশতে দিচ্ছি আমার সঙ্গে—সে কি ভাবছো নেহাতই মিছিমিছি?

তারপর খানিক থেমে আবার বলতো—মামার বাড়িতে নিজের একখানা আলাদা শোবার ঘর পর্যন্ত আমার নেই, জানো। এখানে ইস্কুলের বোর্ডিং-এও আমরা সব টীচারেরা একসঙ্গে একঘরে শুই—নিজের বলতে কোনওদিন আমার কিছু ছিলও না, নিজের ঘর, নিজের সংসার, নিজের রান্নাঘর, কিছুই না…

তারপর গলাটা আরো নিচু করে চোখ নামিয়ে বলতো—এখনও নিজের বলতে আমার কিছুই নেই এক তুমি ছাড়া…

এখন এই যে নির্ভরতা, এই ধরনের মনোভাব—এ আমার কাছে সত্যিই নতুন লাগতো। রমা, রমলা বা সুতপার কাছে আমি ছিলাম প্রায় একটা অলঙ্কারের সামিল। গয়না মেয়েদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ই শুধু নয়, অপরিহার্যও বটে—কিন্তু বলতে গেলে আবার বাহুল্যও তো! অভাবের সময় গয়না বেচেও তো পেট চালাতে হয়, কিন্তু সুকুমারীর কাছে আমি ছিলাম একেবারে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো অবিচ্ছেদ্য। আমাকে বাদ দিয়ে ও কিছু ভাবতেও পারতো না। মনে আছে—কথায়-বার্তায় সুকুমারী যখন-তখন 'আমার ভবিষ্যৎ' না বলে বলতো 'আমাদের ভবিষ্যৎ'।

বলতো—আমাদের এখন থেকে কিছু টাকা জমাতে হবে কিন্তু।

আমি নয়—আমরা, আমার নয়—আমাদের। আমাকে জড়িয়েই ছিল ওর ভবিষ্যৎ, আমাকে কেন্দ্র করেই ওর স্বপ্ন কল্পনা যা কিছু সব, ওর সম্মান আমারও সম্মান, ওর অপমান আমারও অপমান। কিন্তু ওর বহুবচন ছিল আমাদের দু'জনের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ। তৃতীয়জনের আশঙ্কা ওর ছিলই না বলতে গেলে—তাই সে আশঙ্কার আমলও দিতো না ও একেবারে।

সুতরাং এই সব বিবেচনা করে শনিবার দিনটা সুকুমারীর জন্যে আমাকে সংরক্ষিত রাখতেই হতো। সপ্তাহে আর ক'টা দিন আর যার কাছেই কাটাই, শনিবার দিনটা আমাকে সুকুমারীর সঙ্গে কাটাতেই হবে। ভালোবাসার আকর্ষণ আমার ছিল কি ছিল না বা কতটুকু ছিল সে আমি ভাবিনি। কর্তব্য, সহানুভূতি বলেও তো একটা জিনিস আছে, সেই আকর্ষণেই আমি যেতাম।

জিজ্ঞেস করতাম—কোনওদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেও তো ফেলতে পারি—সেদিন?

সুকুমারী বলতো—তুমি করবে বিশ্বাসঘাতকতা? তা হলে আমি মেয়েমানুষ হয়েছি কেন?

বলতাম—মেয়েমানুষ কি তুমি একলাই? রমা, রমলা, সুতপা, সুপ্রীতি ওরাও তো মেয়েমানুষ।

সুকুমারী বলতো—আমি যেমন করে তোমায় চিনি, ওরা কি তেমনি করে তোমায় চেনে—আমার মতো করে ওরা কি তোমায় চায়—সত্যি বলো তো?

তারপর খানিক থেমে বলতো—কমলাদি কি বলে জানো?

—কমলাদি?

—হ্যাঁ, আমাদের ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস, কমলা দত্ত, কমলাদি বলে—স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—'পয়সা থাকলে দারিদ্র্যের ভয় আছে, রূপ থাকলে বার্ধক্যের ভয় আছে, গুণ থাকলে দোষের ভয় আছে, জ্ঞান থাকলে অজ্ঞানের ভয় আছে—পেলে হারাবার ভয় আছে,—আর

আমার ? আমার তো কিছুই নেই—তাই আমার ভয়ও নেই কিছুতে—

জিজ্ঞেস করতাম—কমলাদিকেই বুঝি তোমার সব চেয়ে ভয় স্নুকুমারী ?

স্নুকুমারী বলতো—ভয় ? ভয় কেন হতে যাবে, বরং বলতে পারো ভক্তি—অমন মেয়েমানুষ আমি আমার জীবনে দেখিনি, সত্যি—

—খুব স্নুন্দরী বুঝি ?

—মোটেই না, বরং কুশ্রীই বলা চলে, তবে কমলাদি'র সঙ্গে দু'দণ্ড মিশলে তার আর রূপের কথা মনেই পড়ে না। কমলাদি বলে—আমাকে রূপ দেননি ভগবান বেঁচেছি ভাই, কবে রূপের টানে কেউ হয়তো বিয়ে করে ফেলতো, তখন আর এই ছাত্রী-পড়ানো হতো না। ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে যে-আনন্দ পাই, বিয়ে করে সংসার করে কি তাই পেতাম ?

কমলা দত্তকে তখনও দেখিনি। স্নুকুমারীর মুখেই তার প্রশংসা শুনতাম। চায়ের দোকানে, সিনেমায়, যখন যেখানে গিয়েছি স্নুকুমারী কথায় কথায় কমলা দত্তের কথা পাড়তো।

স্নুকুমারী একদিন বললে—এই দেখো, আজ মামার বাড়ি যাবো বলে এসে তোমার সঙ্গে কাটালাম, কমলাদি জানতে পারলে কিন্তু রাগ করবে।

বললাম—কিন্তু কমলাদি'রও তো একদিন বিয়ে হবে।

স্নুকুমারী বলতো—বিয়ে হবে কে বললে ?

—বিয়ে হবে না ?

—বিয়ে হলে ইস্কুল চালাবে কে ? রামমোহন সেনমশাই, আমাদের সেক্রেটারি, একদিন এই ইস্কুলেই এনে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন—গরীবের মেয়ে বলে। এক পয়সা মাইনে লাগতো না—তখন কমলাদির বয়েস কত আর—চার কি পাঁচ—তখন ছিল মাত্র একটা টিনের চালা—এই দোতলা বাড়িও ছিল না—টীচারদের বোর্ডিংও ছিল না—ওই সেক্রেটারি নিজে পড়াতেন তখন মেয়েদের—তারপর

কমলাদি এল আর ইস্কুলের বরাত খুললো—নইলে আমিই কি এখানে চাকরি পেতাম—না তুমিই এই হপ্তায়-হপ্তায় চার-পাঁচ টাকা খরচ করে রেলের টিকিট কেটে কলকাতা ছেড়ে এই ব্যাণ্ডেলে আসতে আমার জন্যে—

সে আদি ইতিহাস কিছু শুনেছি সুকুমারীর কাছে। আর পরে যখন কমলা দত্তর সঙ্গে পরিচয় হলো তখন তার কাছেও শুনেছি—। রামমোহন সেন ওখানকার বনেদি বড়লোক। ডবল এম-এ. আর বি-এল। প্র্যাকটিস না করে মেয়ে-ইস্কুল করলেন। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে হাতজোড় করে বললেন—আপনাদের পাঁচজনের সহযোগিতাতেই আমাদের ইস্কুলের সাফল্য নির্ভর করছে—আপনারা আমায় সহযোগিতা করলেই আমি কৃতার্থ হবো—আর কিছু নয়।

প্রথমে কেউ ছিল না সঙ্গে। দু'-একজন দয়া করে বাড়ির মেয়েদের ইস্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। গুটি চার-পাঁচ ছাত্রী আর একটা টিনের চালা। রামমোহন সেনমশাই নিজের পয়সায় বই শ্লেট কিনে দিয়েছেন প্রথম প্রথম, বিস্কুট লজেন্সের লোভ দেখিয়েছেন পুজোর সময় পুতুল খেলনা কিনে দিয়েছেন।

তখনও কমলা দত্ত আসেনি, কমলা দত্ত তখন বোধহয় সবে জন্মেছে কিম্বা জন্মায়নি। বাঘ-নিশ্চিন্দিপুরের পানা-পুকুরের ধারে গোলপাতার ঘরে শহর আর সদর থেকে দূরে এক পরিবারে মেয়ে হলো একটা। শাঁখও বাজেনি, উলুও কেউ দেয়নি, কাঁসর ঘণ্টাও বাজায়নি কেউ তার আবির্ভাবকে উপলক্ষ্য করে। নেহাতই একটা মেয়ে, অবাঞ্ছিত। বাপ ছিল না বাড়িতে। নিশুতি রাতের দুর্ঘটনা। তিন ক্রোশ দূর থেকে দাই এসে নাড়ি কেটে দিয়েছিল। মায়েরও প্রায় যায়-যায় অবস্থা। এতদিন পরে যদিই বা হলো একটা, তাও আবার মেয়ে। কেঁদেই ফেলেছিলেন তিনি। যন্ত্রণায় যতটা না কেঁদেছিলেন তার চেয়ে বেশি কেঁদেছিলেন ক্ষোভে, দুঃখে আর অপমানে।

তারপর হুট করে একদিন বাপ এসে হাজির হলো। হুট করে যাওয়ার মতোই ছিল তার হুট করে আসা।

জিজ্ঞেস করলে—ক'টার সময় হলো ?

সব শুনে বললে—মিথুন রাশিতে জন্মালো—তা মেয়ের মুখ মিষ্টি হবে—কিন্তু···

মা বললে—কিন্তু কী ? বাঁচবে তো ?

বাপ বললে—মেয়ে তোমার কাজের হবে খুব—দশজনে সুখ্যাতিও করবে—সবাই ভালোবাসবে, তবে···

তবে কী গো ?

বাপ বললে—শাস্ত্রে আছে মিথুন রাশিতে শনি থাকলে জাতক বন্ধন-যুক্ত হয়—তার ওপর রবির দৃষ্টিও রয়েছে পুরোপুরি—

—তাতে কী হয় গো ?

বাপ বললে—ঠাণ্ডা প্রকৃতির মন হবে, পাঁচজনে মান্যগণ্য করবে, ধর্মভয় থাকবে, কষ্ট সহ্য করতে পারবে—কিন্তু জীবনে সুখ পাবে না কখনও তোমার মেয়ে—

আগে আগে বাড়িতে এলে কখনও বা পাঁচসাত টাকা এনে দিতো মায়ের হাতে। থাকতো খেতো দু'চার দিন বাড়িতে, গুম হয়ে বসে থাকতো ক'দিন। আর দাওয়ায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবতো।

পাড়ার কারো সঙ্গে দেখা হলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো—খুড়ো যে—খুড়ো বলতো—হ্যাঁ—এই এলাম।

কেউ হয়তো তখন প্রশ্ন করলো—কোথায় ছিলে গো য়্যাদ্দিন ?

খুড়ো বলতো—তাঁর সংসারে থাকবার জায়গার কি অভাব আছে ভাইপো—তামাম দুনিয়াটাই যে তাঁর।

—কিন্তু এবার ? এবার পালাবে কী করে খুড়ো ?

খুড়ো বলতো—কোথায় পালাবো ভাইপো—তাঁর রাজ্যে কোথাও পালিয়ে যাবার কি উপায় আছে—পেছনে পেছনে চন্দর সুর্যি তোমার পেছু নেবে না—পালিয়ে কোথায় তুমি যাবে ?

কিন্তু এবার তো খুড়ীর মেয়ে হয়েছে—এবার যেন আর কোথাও যেও না তুমি, বুঝলে !

বাবা মাকে জিজ্ঞেস করতো—ঘরে কাঁদে কে ?

—কে আবার, খুকী।

—বড় কাঁদুনে স্বভাব হয়েছে তো—বলে আকাশের দিকে চাইতো বাবা।

মা বলতো—তা হোক, ছোটবেলায় যত পারে কেঁদে নিক—বড় বয়েসে কেবল হাসবে তাহলে—

বাবা বলতো—ভালো ভালো—কাঁদলে কুম্ভক আপনিই হয়—না কাঁদলে কুলকুণ্ডলিনী জাগবে কেন—ভালো ভালো, কাঁদাই ভালো—ভাগ্যবতী মেয়ে তোমার।

কিন্তু আবার একদিন বলা নেই কওয়া নেই উধাও হয়ে যায় মানুষটা। রাত্তির বেলা জেগে উঠে মা হাতটা খপ করে ধরে ফেলেছে। বললে—এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছো খিল খুলে?

—বাইরে যাচ্ছি—

—ফিরে আসবে এখুনি?

—না, আবার আমার ডাক এসেছে—

—কিন্তু মেয়েকে মানুষ করবে কে?

—মেয়ের কথা তুমি আমি ভাববার কে? যার ধন সেই দেখবে।

—কী খাওয়াবো, কী পরাবো—দুধের মেয়ে—একবার বলে যাও?

বাবা বললে—তুমি আমি তো নিমিত্ত মাত্র গো—ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে—তোমাকে আমাকে যে খাওয়াচ্ছে—সেই-ই খাওয়াবে পরাবে—

বলে সেই যে বাপ চলে গেল আর কস্মিনকালেও এল না। এতদিন মাঝে মাঝে তবু এক-একবার আসতো, বাড়িতে দু'দণ্ড থাকতো, এবার মেয়েই হলো কাল। বন্ধনই মায়া, মায়ার বন্ধন বড় বন্ধন। সেই বন্ধন থেকে একেবারে মুক্তি হলো, কিন্তু কথাগুলো তার অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল শেষ পর্যন্ত।

রামমোহন সেনমশাই তখন ইস্কুল করেছেন হুগলীতে। পাড়ার পাঁচজন পরোপকারী তাঁর কাছে গিয়ে সব বৃত্তান্ত বললে, দুঃখী মা, বাপ নিরুদ্দেশ—এমন বিপদে আপনি ছাড়া আর কার ওপরেই বা ভরসা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

রামমোহন সেন বললেন—তা থাকুক—

থাকা মানে থাকা-খাওয়া-পরা লেখাপড়া করা—সব। যার ধন সেই দেখলো, বাপ নিরুদ্দেশ—মা রইল গাঁয়ে কেবল নিমিত্তমাত্র গর্ভধারিণী হয়ে। বাঘ-নিমুন্দিপুরের মাটির সঙ্গে সেই শেষ সম্পর্ক কমলা দত্তের।

রামমোহন সেন সাতপুরুষের বড়লোক। বিরাট পৈতৃক জমি-জমা, ক্ষেত-খামার, কাছারি-সেরেস্তা। অমন সাত হাজার বেরিয়ে যায় এক-দণ্ডে আবার সতেরো হাজার ফিরেও আসে তক্ষুনি। মোটাসোটা ফরসা স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ চেহারা। বাঁ-হাতে একটা সোনার নাম লেখা তাবিজ। তেরো চোদ্দটা ছেলে মেয়ে, গোলগাল আহ্লাদী বউ ঘরের ভেতর। তার গা-ভরা গয়না, গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান, ঘর-ভরা বই, বাড়িভরা ছেলে-মেয়ে আর সিন্দুকভরা টাকা। খাও-দাও আনন্দ করো, দীয়তাং ভুজ্যতাং ভাব।

কিন্তু ভারি কড়া লোক। নিয়ম-কানুন বাঁধা সব দিকে। সকালবেলা ছ'টার সময় সকলের ঘুম ভাঙতে হবে, আর ওদিকে রাত দশটার পর আলো নিবোতে হবে বাড়ির। সকাল সাতটায় যেমন নিজের কাছারি ঘরের টেবিলে চা আসা চাই তেমনি দুপুর বারোটায় চাই রান্নাবাড়িতে ভাত খাওয়ার ডাক। তা সে ইস্কুল কমিটীর জরুরী মিটিংই থাক আর ভবরাজ্য ডুবেই যাক। ঘড়িতে যদি দেখেন বারোটা বাজতে পাঁচ তো বলেন—আমি তাহলে উঠি এখন—

উঠি বললে আর কেউ তাঁকে বসাতে পারবে না, স্বয়ং শিবেরও সাধ্যি নেই আর খানিকক্ষণ তাঁকে আটকে রাখেন। তখন যাবেন অন্দর-মহলে। খেতে বসলে পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করবে একজন। আর একজন দেখিয়ে দেবে—এটা অড়রের ডাল—ওটা মুগের—

জিজ্ঞেস করবেন—ওই পদ্মকাটা বাটিতে, ওটা কী?

—আজ্ঞে, আলু-বড়ির ঝাল।

—বেশ বেশ—পাথর বাটিতে কীসের অম্বল?

—লাউ-এর।

সব জানা হলে তবে এক-এক করে খেতে শুরু করবেন।

বলবেন—রুই মাছটা কে রেঁধেছে আজ?

এই সংসারেরই একটা কোণে একদিন কমলা দত্ত এসে উঠলো। আরো তেরো-চোদ্দটা ছেলে-মেয়ে ছিল বাড়িতে—তাদের সংখ্যা আর একটা বাড়লো। সমুদ্রে এক ফোঁটা জল—কেউ জানতেও পারলে না। আর অতো যে কাঁদুনে মেয়ে কমলা দত্ত, সে-ও এ-বাড়িতে এসে ঠাণ্ডা হয়ে গেল সব দেখে শুনে। ইস্কুলে পাড়ার আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে পড়ে এক কোণে বসে, আবার নিঃশব্দে গিয়ে বাড়িতে ঢোকে। ছোট-বেলাতেই জীবনের চরম আঘাত পেয়ে যেন থতোমতো খেয়ে গিয়েছে মেয়েটা। কোন্ কোণে কখন বেড়ে উঠেছে সে, বড় হয়েছে সে, কেউ টেরই পায়নি। এত যে রাশভারি সাবধানী কড়া লোক রামমোহন সেন—তিনিও পর্যন্ত লক্ষ্য করেননি, ফ্রক ছেড়ে কবে কমলা দত্ত শাড়ি পরেছে, চুলে খোঁপা বেঁধেছে, গায়ে ব্লাউজ দিয়েছে।

হঠাৎ একদিন নজরে পড়ে গেল রামমোহন সেনের।

অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কে তুমি?

কমলা দত্ত বাড়ির মধ্যেই ঢুকছিল। বললে—আমি—

—নাম কি তোমার?

—কমলাবালা দত্ত।

—বাঘ-নিম্বুন্দিপুরের কমলা দত্ত! কেমন পড়াশুনো হচ্ছে তোমার?

লজ্জায় কমলা দত্ত ভালো করে কথাই বলতে পারলে না। কিন্তু হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল সংসারে। রামমোহন সেনের আহ্লাদী বউ হঠাৎ সেদিন ডেকে পাঠালেন নিজের বসবার ঘরে। আদর করে খাওয়া-লেন, অন্য ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করলেন, আলমারি থেকে বার করে দিলেন কয়েকটা ভালো ভালো দামী শাড়ি। বললেন—এগুলো এখন থেকে পরো মা তুমি—তোমার বয়েস হচ্ছে—

আর বাড়িতে পড়াবার ভারটা নিলেন কর্তা নিজে।

বাঘ-নিম্বুন্দিপুরের স্বপ্ন ভেঙে কমলা দত্ত তখন থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের

কুটিল পথে চলতে শুরু করলো। রামায়ণ আর মহাভারত, ব্রতকথা আর পাঁচালী, পাটিগণিত আর স্বাস্থ্য-সোপান, ইতিহাস আর ভূগোল —এই হলো তার দিবারাত্রের ব্রত!

রামমোহন সেন বললেন—এমনি করে সাধনা করলেই তবে একদিন মানুষ হতে পারবে—বুঝলে?

আরো বললেন—আমি ইস্কুল করেছিলাম পুতুল তৈরি করবার জন্যে নয়, মানুষ তৈরি করবার জন্যে—তুমি মেয়েমানুষ, কোনও পুরুষমানুষের চেয়ে তোমার কাছে মনুষ্যত্বের দাবী আমার এতটুকু কম নয়—দশজনে যেন তোমার যশগান করে, দশজনে যেন তোমায় শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, এমন ব্যবহার করবে, এমন চাল-চলন করবে—এমন জীবন-যাপন করবে।

বললেন—বিলাসিতা বা ভোগবাসনা ও-তো দু'দিনের, ওতে অবসাদ আছে, কিন্তু শিক্ষার যে আনন্দ, জ্ঞানের যে দীপ্তি তা সারাজীবনই অম্লান থাকে—খাঁটি সোনায় যেমন কলঙ্ক ধরে না—জ্ঞান হলো তেমনি খাঁটি সোনা—

বললেন—স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করো—তাঁর কথাগুলো অনু-ধ্যান করতে চেষ্টা করো—তবেই জীবন সার্থক হবে।

এই হলো সূত্রপাত।

তারপর মাইনর ইস্কুলের সব ক'টা ধাপ ওঠা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আর ক্লাশ নেই।

কমলা দত্ত বললে—এবার আমি কী পড়বো?

রামমোহন সেন বললেন—পড়ার কি শেষ আছে, আরো পড়তে হবে তোমায়, আরো বড় হতে হবে—আরো জ্ঞান আরো আলো। তোমার জন্যে আমি ও-ইস্কুলকে হাই ইস্কুল করবো, চিঠিপত্র লেখা চলছে—হাই ইস্কুল না করলে আর চলছে না—মেয়েও অনেক বেড়ে গিয়েছে।

শুধু হাই ইস্কুল করলেই হয় না। টীচারদের থাকবার-খাবার ব্যবস্থাও করতে হয়। তখন বোর্ডিং হলো, নতুন বাড়ি হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন

দিয়ে নতুন টীচার আনা হলো। চারিদিকে পর্দা-ঘেরা বাড়ি। বাইরে থেকে মেয়েদের পা পর্যন্ত যেন কেউ দেখতে না পায়, একেবারে পুরোপুরি পর্দা-ইস্কুল। বছরে বছরে এক-এক ক্লাশ করে বেড়ে বেড়ে যেবার ফার্স্ট ক্লাশ হলো, সেইবারই প্রথমে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলে কমলা দত্ত।

রামমোহন সেনমশাই স্কুলের লাইফ সেক্রেটারি। নিজে তদারক করে মেয়েদের কলকাতায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা দিইয়ে এলেন। পাশ করলো কমলা দত্ত।

রামমোহন সেনমশাই কমলা দত্তকে সেই ইস্কুলেরই হেড মিস্ট্রেস করে দিলেন। প্রাইভেট আই-এ, বি-এ. সব পরীক্ষা দিইয়ে দিলেন রামমোহন সেন।

কমলা দত্ত বললে—এবার ?

রামমোহন সেন বললেন—পড়া তুমি ছেড়ো না তা বলে—আমি ও-ইস্কুলকে এবার কলেজ করবো—আমার বহুদিনের সাধ, মানুষ তৈরী করবো।—তোমাকে আমি নিজের মনের মতো করে গড়েছি—তুমিই হবে প্রিন্সিপাল—লেডি প্রিন্সিপাল। কেন, ভয় হচ্ছে, পারবে না ?

ঠিক এই সময়েই কাণ্ডটা ঘটলো।

জম-জমাট হুগলী গার্লস হাই ইস্কুলের তখন চারিদিকে সুখ্যাতি। উত্তরপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, সিঙ্গুর, দ্বারবাসিনী, গোঁসাই মালিপাড়া, দীঘা, পাণ্ডুয়া, চুঁচড়ো থেকে পর্যন্ত মেয়েরা আসে। তাদের জন্যে থাকবার হোস্টেল আছে। আগা-গোড়া পর্দা। পর্দা দিয়ে ঘেরা হোস্টেল বোর্ডিং সব। মেয়েরা হোস্টেল থেকে বেরিয়ে ইস্কুলে পড়তে আসে। কেউ দেখতে পায় না। মস্ত বড় কম্পাউণ্ড, তিরিশ বিঘে জমি নিয়ে ইস্কুলের এলাকা, চারদিকে জেলখানার মতো লতাপাতায় বেড়া দেওয়া পাঁচিল। ভেতরে বেড়াও, হাওয়া খাও, দোলনায় দোল খাও, পুকুর, মন্দির, বাগান, সব পাবে।

নৈবেদ্যর কলার মতন ইস্কুলের মাথার ওপর শুধু সেক্রেটারি রামমোহন সেন। একমাত্র পুরুষ। আর তার নিচেই তার একমাত্র

বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কমলা দত্ত। স্কুল কমিটী একটি আছে বটে কিন্তু সে কেবল নামে। সেক্রেটারির হাতের মুঠোর মধ্যে সব। লাটাই ধরে থাকেন রামমোহন সেন। কিন্তু ইস্কুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু কমলা দত্তের মাধ্যমে।

ইস্কুলের এলাকার ভেতরে কমলা দত্তই প্রধান। কমলা দত্তই সর্বেসর্বা।

পুকুরের জলে সাবান কেচেছে কেউ, ঠিক দেখে ফেলেছে কমলা দত্ত। বাগানের ফুল ছিঁড়েছে কেউ ঠিক ধরে ফেলেছে কমলা দত্ত—। মেথরাণী ঝাঁট দিতে গাফিলতি করেছে—কমলা দত্তর কাছে ঠিক বকুনি খেতে হয়েছে। ভোরবেলা সকলের আগে উঠে সারা চৌহদ্দিটা নিঃশব্দে একবার ঘুরে আসে। কোথায় কে অনিয়ম করেছে, কে বেআইনী করেছে নোংরা করেছে ঘর দোর উঠোন। সব দিকে স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয় তাকে।

কমলা দত্ত হাসতে হাসতে বলে—কাল বিকেলবেলা বাগান ঝাঁট দিতে বুঝি ভুলে গিয়েছিলে কালোর-মা?

কিম্বা বলে—রাত্তির বারোটা পর্যন্ত তোর ঘরে আলো জ্বলছিল কেন রে প্রীতি?

রামমোহন সেন বলেন—এবার ভাবছি মেয়েদের হপ্তায় একদিন রান্না শেখার ক্লাশ করবো—তোমার কী মত কমলা?

রামমোহন সেনের নিজের অন্দরমহলেও তখন অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছে। আহ্লাদী বউ আরো আহ্লাদী হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে-থা হয়ে গিয়েছে, নাতিপুতি হয়েছে—তবু দেখে মনে হয় এখনও যেন কচি খুকিটি। এখনও গয়নার দোকানের ক্যাটলগ্ নিয়ে বসে বসে নতুন গয়নার প্যাটার্ন খোঁজেন।

বলেন—আজ সকালে কাঁটা চচ্চড়িটা কে রেঁধেছিল গা ঠাকুরঝি?

বিকেলবেলা বিছানায় আড়মোড়া খেতে খেতে বলেন—আজ তোরা

চা দিবি না নাকি রে ? খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকলেই চলবে আমার—গা ধোয়া চুল বাঁধা কিছু হয়নি যে রে এখনও—

গা ধুতে যাবার আগে কানের গায়ের গয়নাগুলো আলমারিতে তুলে রাখেন, আবার এসে চাবি খুলে পরেন। বলেন—আর পারিনে বাপু কাজের ঠেলায়—খেটে খেটে গতর গেল আমার—

গতর কিন্তু তাঁর বরাবরই ঠিক আছে। এখন অবশ্য এ-বাড়িতে কচিৎ কদাচিৎ আসা হয় কমলার। কমলা দত্ত যখন এই এতটুকু পাঁচ বছরের মেয়ে, সেই সময় থেকেই দেখে আসছে।

তবু সেক্রেটারির কাছে নানা কাজে তো আসতে হয় তাকে মাঝে মাঝে। তখন মাসীমার সঙ্গে একবার দেখা করে যায়।

আহ্লাদী মাসীমা বলেন—ওমা, কমলা-মেয়ে যে, বলি কার মুখ দেখে উঠেছিলুম লো আজ—

কমলা দত্ত বলে—কেন মাসীমা, আমি তো সময় পেলেই আসি—

আহ্লাদী মাসীমা বলেন—তা তোর ইস্কুলের বাড়ি হলো নতুন। হেড মাস্টারণী হলি—মাইনে বাড়লো—মাসীমাদের কী এখন মনে থাকবে! বিনি এসেছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে, বলছিল—কমলাদির খুব নাম হয়েছে—নাতনীকে তোর ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে বলছিল—বলছিল কমলাদির কাছে পড়লে তবে মানুষ হবে আমার মেয়ে—

কমলা দত্ত বললে—বিনিরা কেমন আছে সব মাসীমা ?

আহ্লাদী মাসীমা বললেন—এই তো আসছে চোত্‌মাসে ছেলে হবে বিনির, কাঁচা সাধে এসেছিল, তা একটা বিছেহার গড়িয়ে দিলুম, পনেরো ভরি সোনা, তার বানিই বাইশ টাকা নিলে গলা কেটে—বললাম আটপৌরে হার তো তোর দুটো, এটাও পরিস মাঝে মাঝে—। তা তুই এবার তো হেড মাস্টারণী হলি, এবার একটা গয়না গড়া—গলাটা যে নেড়া নেড়া লাগে—

কমলা দত্ত বললে—না না, মাসীমা, মাস্টারদের দেখলে আবার মেয়েরাও তো শিখবে ওই সব—আমাদের ও-সব নেড়া থাকাই ভালো—

আহ্লাদী মাসীমা গালে হাত দিলেন।

বললেন—ওমা, তুই বলিস কী? তা বলে মাস্টারণী হয়েছিস বলে কি মনের সাধ আহ্লাদ নেই নাকি—? মাস্টারণী হয়েছিস বলে চিরকাল মাস্টারণীই থাকতে হবে? বিয়ে-থা···

কমলা বললে—না মাসীমা, সেনমশাই ও-সব পছন্দ করেন না—

তারপর থেমে বললে—আর তা ছাড়া, আমাদের ইস্কুলের এত নাম যে চারদিকে সে তো ওই জন্যেই, আর আমিই যদি হেড মিষ্ট্রেস হয়ে গয়নাগাটি পরে থাকি তো ইস্কুলে অনেক গরীব মেয়ে আছে তারা যে মনে কষ্ট পাবে মাসীমা—

আহ্লাদী মাসীমা বললেন—ঠিক কথা বলেছিস মা, ঠিক কথা, কর্তা নিজে তোকে ছোটবেলা থেকে গড়েপিটে মানুষ করেছে, হবেই তো! কর্তা নিজেও লেখাপড়া নিয়ে থাকতে ভালোবাসে, তোকেও ঠিক সেই রকম তৈরী করেছে মা—আমি গুরুজন হই, আমি আশীর্বাদ করছি তোর ইস্কুল আরো বড় হোক, দুটো পাশ দিয়েছিস, এবার আরো একটা পাশ দে—তোর নাম যশ হোক—আর কী বলবো—কিন্তু মাসী-মাকে ভুলিসনে যেন মা···তা আজকে এখানে চাট্টি খেয়ে যাস, জানিস—

কমলা বললে—না মাসীমা, আজকে মাপ করো—

—কেন রে, আজ মাংসের কোর্মা হয়েছিল, চাট্টি গরম ভাতের সঙ্গে···

কমলা বললে—মাংস আমি খাই না তো মাসীমা—

—সে কি, মাংস খাওয়া আবার ছাড়লি কবে?

—সে কবে ছেড়েছি—তা ছাড়া আমাদের হোস্টেলে কড়াইশুঁটি দিয়ে কপির ডাল্‌না হয়েছে আজ—রাত্রে আমি বেশি খাই না মাসীমা—দু'খানা রুটিতেই আমার পেট ভরে যায়—

—ওমা, এই বয়েসেই এত কম খাস, আমার তো বাপু আটখানা না হলে পেট ভরে না রে—

—বেশি খেলে যে ঘুম পায়, পড়াতে গেলে কেবল ঘুমে চোখ ঢুলে আসে—

আহ্লাদী মাসীমা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বললেন—অতো পড়িসনে

বাছা—পড়ে পড়েই চেহারা কালি হয়ে যাচ্ছে তোর—শেষকালে জামাই এলে তখন...

এ-কথার পর কমলাকে পালিয়ে আসতে হয় মাসীমার কাছ থেকে।

সেক্রেটারির সামনে বসে কিন্তু তখন আবার অন্য কথা শোনবার পালা। সেক্রেটারি রামমোহন সেনের কাছারিতে বিরাট টেবিলের সামনে বসে কমলা দত্ত আবার অন্য মানুষ। রামমোহন সেন যেন যাদু জানেন, যেমন করে বেদেরা সাপকে বশ করে এ-ও যেন তেমনি। সেক্রেটারির কাছে থাকতেই যেন ভালো লাগে কমলা দত্তর। সেক্রেটারি 'হ্যাঁ' বললেই কমলা 'হ্যাঁ' বলে, তিনি 'না' বললেই কমলাকে 'না' বলতে হয়, সেক্রেটারির কথার প্রতিধ্বনি মাত্র যেন সে।

সেক্রেটারি প্রশ্ন করেন, আবার সেক্রেটারিই উত্তর দেন। ভালো ভালো কথা সব। সদুপদেশ।

কমলা দত্ত শুধু শুনে যায়। কমলা দত্তর উত্তর যেন তিনি আশাও করেন না।

সেক্রেটারি বলেন—মনের মতন কাজ কাকে বলে বলো তো কমলা?

কমলা কিছুই উত্তর দেয় না।

রামমোহন সেন বলেন—মনের মতন কাজ আমরা তাকেই বলি যে-কাজের সঙ্গে আমাদের মনের যোগ আছে, যে-কাজের সঙ্গে বাধ্য-বাধকতার কোনও সম্পর্ক নেই—যার সঙ্গে আমাদের আনন্দের আর পরিতৃপ্তির সম্বন্ধ—তাই না?

এবারও কমলা দত্ত কোনও উত্তর করে না।

সেক্রেটারি আবার বলেন—সেই মনের মতন কাজ পেলে তো মূর্খেরাও করতে পারে—তার মধ্যে আর বাহাদুরিটা কী—বলো?

কমলা আস্তে একটু মাথা নেড়ে শুধু বলে—হ্যাঁ—

সেক্রেটারি বলেন—কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমার অনেক আশা কমলা—তোমাকে আমি মনের মতন করে গড়ে তুলতে চাই—আমি চাই সব কাজকে তুমি নিজের মনের মতন করে নেবে—এই

ইস্কুলের কাজের মধ্যেই, এই মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে থেকেই নিজের আনন্দের খোরাক পরিতৃপ্তির মশলা খুঁজে নেবে। তুমি সাধারণের মতো জীবন-যাপন করতে আসোনি, তোমার কর্তব্য আরো অনেক বড়। তোমার দায়িত্ব আরো অনেক-অনেক উঁচু—জোয়ান-অব-আর্কের কথা মনে করো। সিস্টার নিবেদিতার কথা স্মরণ করো—

কথাগুলো বলে সেক্রেটারি অনেকক্ষণ কমলা দত্তর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন।

কমলা তখন মুখ নিচু করে নখ দিয়ে জুতোর চামড়া খুঁটছে।

সেক্রেটারি বললেন—এবার যাও—

ঘোড়ার গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়েই ছিল। কমলা দত্ত আস্তে আস্তে ফাইলগুলো হাতে নিয়ে গাড়িতে উঠে জানলার খড়খড়ি বন্ধ করে দিলে।

প্রীতি বলে—আজকে আমি হাফ্‌-ডে ছুটি চাই কমলাদি—

কমলা নিজের ঘরে কাজ করতে করতে মুখ তুলে বলে—দরখাস্ত করেছিলে নাকি—কই, মনে পড়ছে না তো—

প্রীতি বলে—হাফ্‌-ডে'র ছুটি তারও আবার দরখাস্ত করতে হবে?

কমলা বলে—তা, হলেই বা হাফ্‌-ডে—ইস্কুলের ডিসিপ্লিন নেই? জানো না, সেক্রেটারি এ-সব পছন্দ করেন না—

—সেক্রেটারিই বুঝি সব—তুমি কেউ নও? তুমিও তো হেড মিস্ট্রেস কমলাদি, তোমার কোনও ক্ষমতা নেই তা বলে?

কমলা গম্ভীর গলায় বলে—তর্ক করো না প্রীতি, যা বলছি শোনো—

অন্য সময়ে যখন স্কুলের ঘণ্টার বাইরে হোস্টেলে বসে সবাই মিলে গল্প করে, কমলা দত্ত বলে—তোমরা অন্য ইস্কুলের সঙ্গে এর তুলনা করো না ভাই। পয়সা নিয়ে যারা পড়ায়, লেখাপড়া শেখাবার নামে যারা ব্যবসা করে, তাদের কথা আলাদা—এখানে লেখাপড়া শেখানোটা উপলক্ষ্য, মনুষ্যত্ব শেখানোটাই বড়—আমাদের সেক্রেটারি তো সেই কথাই আমাকে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দর

কথা মনে করে দেখো—ব্রহ্মচর্যই স্ত্রী-পুরুষের প্রথম ধর্ম!—আজ তোমরা হাসতে পারো কিন্তু জোয়ান-অব-আর্কের কথা মনে করে দেখো তো—সিস্টার নিবেদিতার কথা মনে করে দেখো তো—

এক-এক সময়ে রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার আগে স্বামী বিবেকানন্দর ছবির সামনে প্রণাম করতে করতে অনেকক্ষণ আপন মনে ভাবে কমলা দত্ত। সারাজীবন সে সেক্রেটারির কাছে কৃতজ্ঞ। বাপ-মা-মরা গরীবের মেয়ে। সেই বাঘ-নিমুন্দিপুরের পানা-পুকুর আর ম্যালেরিয়ায় একদিন হয়তো মরেই যেতো সে। বাবার কথা মনে পড়ে না। চেহারা দেখলেও চিনতে পারবে না সে আজ। লোকে বলে—তিনি নাকি ছিলেন মুক্ত-পুরুষ। জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সব অতিক্রম করে সমস্ত কিছু জয় করেছিলেন। কিন্তু সেক্রেটারি বলেন—নিজের মুক্তি নিয়ে কী হবে? নিজের মুক্তি কামনা, সেও তো একধরনের মহাস্বার্থপরতা!

কমলা দত্ত ভাবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম আসবার আগে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা চিন্তা করে। একদিন এ-ইস্কুল আরো অনেক বড় হবে। এই হোস্টেলের বাড়ির ছাদে উঠলে যে-দিকে চাইবে কেবল দেখা যাবে বাড়ি আর বাড়ি। মেয়েদের বোর্ডিং। মেয়েদের ইস্কুল। মেয়েদের সেলাই শেখার জন্যে মেশিনের পর মেশিন বসে গিয়েছে চারিদিকে। ঘর্ ঘর্ শব্দ আসছে কানে। উত্তর দিকে মেয়েদের জন্যে ইস্কুলের নিজস্ব ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, তারপর পুবদিকে গেলেই দেখা যাবে ঘেরা বাগানের সামনে মেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষার ঘর। তার পাশেই বিরাট লাইব্রেরী। পৃথিবীর যত বই, ভালো ভালো ধর্মগ্রন্থ, শিক্ষার সবরকম সরঞ্জাম ভর্তি। তারপর ডানদিকে ঘুরলেই দেখা যাবে বিজ্ঞানের ঘর। মস্ত বড় ল্যাবরেটারি। কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্সের, বোটানি আর জুলজির যন্ত্রপাতি, আর মিউ-জিয়াম। তারপর বাঁ পাশ দিয়ে সোজা চলে যাও। লাল সুরকির পথ। দু'পাশে লম্বা লম্বা ঝাউগাছ। সামনে চাইলেই নজরে পড়বে মিটিং হল। মস্ত বড় বড় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে দেখতে পাবে ভেতরে

বিরাট হল্। হলের চারদিকে বড় বড় ছবি টাঙানো। প্রথমেই সিস্টার নিবেদিতার। তারপর জোয়ান-অব-আর্ক, তারপর দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, সাবিত্রী, সীতা থেকে শুরু করে ম্যাডাম কুরি, সরোজিনী নাইডু কেউ আর বাদ থাকবে না। মাঝে মাঝে পৃথিবীর সব দেশ থেকে জ্ঞানী গুণীরা আসবেন বক্তৃতা করতে। কত য়ুনিভার্সিটির কত ভাইস্-চ্যান্সেলর আসবে। তারা কমলা দত্তকে দেখে অবাক হয়ে যাবে।

বলবে—আপনার নামই কমলা দত্ত? নাম শুনেছি বটে আপনার—

পাশেই সেক্রেটারি রামমোহন সেনমশাই দাঁড়িয়ে থাকবেন, বলবেন—সিস্টার নিবেদিতার আদর্শেই আমি এঁকে গড়েছি।

বড় আদর্শ, বড় চিন্তা, বড় লক্ষ্য থাকলেই একদিন বড় হওয়া যাবে।

সেক্রেটারি বলেন—শিক্ষা বলতে তো কতগুলো শব্দ শিক্ষা নয়—মনের নানা শক্তিগুলোর বিকাশকেই বলে প্রকৃত শিক্ষা।

সেই শিক্ষাকেই আদর্শ বলে, ধ্যান, জ্ঞান বলে মেনে নিয়ে কমলা দত্ত এগিয়ে চলেছে, সিদ্ধি একদিন তার হবেই।

মেয়েরা ভক্তি যেমন করে আবার ভয়ও তেমনি করে কমলা দত্তকে।

বাগানে খেলা করতে করতে হঠাৎ যদি কারো নজরে পড়ে যায়, সব ঠাণ্ডা। বলে—ওই রে, বড়দিদিমণি আসছেন—

বড়দিদিমণি কিন্তু কিছুই বলেন না, বকেনও না। বরং মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

বলেন—বেশ বেশ, খেলছো তোমরা—কিন্তু মন দিয়ে লেখাপড়া করছো তো?

কিম্বা হয়তো কারো চিবুকে হাত দিয়ে বলেন—তুমি কোন্ ক্লাশে পড়ো মা—

মেয়েটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে উত্তর দেয়।

বড়দিদিমনি বলেন বেশ লক্ষ্মী মেয়ে তো—বানান করো তো মা 'আত্মোৎসর্গ'—

মেয়েটি টপাটপ্ বানান করে ফেলে।

—বাঃ বেশ! বড় হলে আত্মোৎসর্গ করতে পারবে তো মা? পরের জন্যে, দেশের জন্যে, দশের জন্যে?

আর একজনের কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—তোমার নামটি কী মা?

—সুনিতা।

—বাঃ, বেশ নাম, কিন্তু নামের মানে জানো তো—তুমি সকলের বন্ধু, তুমি কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না, কারোর ভালোতে হিংসে করবে না,—তবেই তোমার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম সার্থক হবে—বুঝলে?

রোজই ক্লাশ বসার পর চারিদিকে একবার করে তদারক করতে বেরোয় কমলা দত্ত। কোন্ ক্লাশের ছাত্রীরা গোলমাল করছে, কোন্ ক্লাশের টীচার ফাঁকি দিচ্ছে। তারপর এসে বসে নিজের রুমে। বিরাট রুম, সিস্টার নিবেদিতার একটা ছবি এ-ঘরেও টাঙানো। সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার সামনে বসে চিঠিপত্রের ফাইল নিয়ে কিছুক্ষণ বসতে হয়। ছাত্রীদের অভিভাবকরা আসেন। ফ্রি-শিপ করবার আবেদন। চার মাস মাইনে বাকি পড়েছে। বই-এর প্রকাশক। ইস্কুলে বই ধরাবার অনুরোধ। সকলের দাবী, সকলের উপরোধ অনুরোধ আবেদন-নিবেদন শুনতে হয়: সকলের সঙ্গেই বিনীত ভদ্র ব্যবহার।

সকলেই আবার একে একে নমস্কার করে চলে যায়। ভারি খুশি হয় কমলা দত্তর ব্যবহারে। চারিদিকে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

বলে—ভারি সাদাসিধে মানুষ তো, দেখুন—ভালো মানুষ আছে বৈকি সংসারে, নইলে সংসার চলছে কেন মশাই?

অভিভাবকরা বলেন—আপনার কাছে মেয়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি বলেই তো এই ইস্কুলে দেওয়া, নইলে মেয়ে-ইস্কুল কি আর নেই—কাছেই তো রয়েছে, সেখানে মাইনেও কম, বাড়ির কাছেও হয়, তবু—

সুকুমারী তখন বরানগরের ললিতা স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরি করতো। কিন্তু ভালো লাগতো না জায়গাটা। কলকাতাটা কাছে হতো

বটে, আদিনাথের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করবার সুবিধেও ছিল প্রচুর। মাইনেও খারাপ নয়। পঁয়ষট্টি টাকা মাইনে, ডিয়ারনেস এলাউএন্স ছাড়া। কিন্তু বনিবনা হতো না হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে। ভারি ঠেকারে লোক। কাউকেই মানুষ বলে মনে করেন না। তিনদিন কামাই করলে একদিনের মাইনে কাটা যায়।

বলতেন—একটু লিবার্টি পেলেই আপনারা কেবল মাথায় ওঠেন দেখেছি।

সুকুমারী বলে—জ্বর হয়েছিল—যদি বলেন তো ডাক্তারের সার্টিফিকেট আনতে পারি।

আদিনাথ সেদিন যেতেই সুকুমারী ব'লে—তুমি একটা অন্য ইস্কুল দেখো, এখানে আর ভালো লাগে না আমার।

হুগলীর এই ইস্কুলটার খবর আদিনাথই দিয়েছিল। চাকরি খালির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল কাগজে। তাই দেখে দরখাস্ত করে দিয়েছিল আদিনাথই।

সুকুমারীর আর কে আছে! মামা, মামাতো ভাইয়েরা! আছে বটে কিন্তু পিসীমার মেয়ের জন্যে তাদের অতো ভাবনার সময় নেই। সুকুমারীর আত্মীয়-কুটুম্বদের সম্পর্কের নৌকোতে বুঝি একটা মস্ত ফুটো ছিল কোথাও, কারোও নজরে পড়েনি। এমন কি সুকুমারীর নিজের নজরেও পড়েনি। নজরে পড়েছিল কেবল আদিনাথের। আদিনাথই এসে সেই ফুটোটা একদিন নিঃশব্দে আবিষ্কার করলে। তারপর সেই ফুটো দিয়েই সুকুমারীর জীবনে প্রবেশ করে একেবারে সর্বেসর্বা হয়ে উঠলো। সুকুমারীর জামা-কাপড় কিনতে হবে, সঙ্গে যেতে হবে আদিনাথকে। সুকুমারীর চাকরির দরখাস্ত, ছুটির দরখাস্ত, সুকুমারীর অসুখের সময় ডাক্তারের কাছে যাওয়া। সুকুমারীর জন্যে স্নো, ক্রিম, পাউডার কেনা, যাবতীয় কাজ আদিনাথের।

নতুন ইস্কুলে চাকরির দরখাস্ত পাঠানো আগেই হয়ে গিয়েছিল। তারপর ইন্টারভিউ দিতে যাবার দিন আদিনাথই সঙ্গে করে নিয়ে গেল। এর আগে ব্যাণ্ডেল স্টেশনে কখনও আসেনি দু'জনের কেউই।

হুগলী গার্লস হাই স্কুল। সকাল সাড়ে ন'টায় খেয়ে-দেয়ে নিয়ে হাজির হয়েছে দু'জনে।

সুকুমারী বলল—তুমি কখনও এসেছো এদিকে আগে ?

আদিনাথ বললে—আমার আসবার কখনও দরকারই হয়নি—তুমি ?

দু'জনেই নতুন। কিন্তু নামকরা স্কুল—চেনবার অসুবিধে হবে না। খান তিন-চার ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি অশথগাছ তলায় দাঁড়িয়ে সোয়ারীর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

একজন সহিস বললে—আইয়ে বাবু, আইয়ে মাইজি—নতুন গাড়ি, হাওয়া উড়িয়ে ছুটবো—

আদিনাথ বললে—আমি বসে আছি ওয়েটিংরুমে, তুমি বরং ঘুরে এসো—

শেষ পর্যন্ত সুকুমারী একলাই গেল। আজো আদিনাথের মনে আছে ব্যাণ্ডেল স্টেশনের ধূসর প্ল্যাটফরমের ওপর সারা দুপুরটা কাটাতে সেদিন ক'টা সিগারেট তাকে খেতে হয়েছে। একটার পর একটা। তখনও সুকুমারী আসে না, দু'-একটা ট্রেন আসে, খানিকক্ষণ ব্যস্ততা বাড়ে, আবার ট্রেন চলে গেলেই নিঃঝুম। পান বিড়ি সিগারেটের দোকানী আবার দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে ঘুমোয়। উল্টোদিকের প্ল্যাটফরমের ওপরে কেবল জঙ্গল। জঙ্গলের শ্যামল বিস্তৃতির দিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে যখন প্রায় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বার অবস্থা, তখন এল সুকুমারী হাসতে হাসতে।

আদিনাথ বললে—হাসছো যে—চাকরি হয়ে গেল নাকি ?

সুকুমারী বললে—আমি চাকরি না করতে চাইলেও ওরা আর ছাড়বে না আমাকে—

—তার মানে ?

সুকুমারী বললে—চাকরি আমারই হলো, আর কারোর হলো না—ছাড়তেই চায় না আমাকে। বলে—অনেকদূর থেকে এসেছেন,

খেয়ে-দেয়ে যাবেন একেবারে—

—তা তুমি খেয়েই এলে নাকি ?

—বারে, তুমি না খেয়ে আছো আর আমি বুঝি খেতে পারি ! আমার তো মন পড়ে রয়েছে এখানে—

—তা খেয়ে এলেই পারতে !

—ওই দেখো, তুমি রাগ করলে তো ? আমি কি দেরি করেছি ইচ্ছে করে ? ইন্টারভিউ কখন হয়ে গিয়েছে, চলে আসবার সময় বলতে গিয়েছি। ছাড়বে না। বলে—একটু দাঁড়ান, এখানে খেয়ে যাবেন। অনেক কষ্ট করে ছাড়ান পাবার জন্যে বললাম—আমার সঙ্গে একজন আছেন—

আদিনাথ বললে—ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন না—কে ?

সুকুমারী বললে—জিজ্ঞেস করলে বৈকি—আমি বলবো কেন ? আমি এড়িয়ে গেলাম—ভারি ভালো লোক কিন্তু হেড মিস্ট্রেস—এমন মিষ্টি মানুষটি, যেন মায়ের মতন—সবাই খুব সুখ্যাতি করলে ওঁর। ইস্কুলের সব টীচাররাও প্রশংসা করতে লাগলো। ওঁরা বললেন—আপনার কোনও অসুবিধে হবে না এখানে, আমাদের সেক্রেটারি তো ব্যবসা করবার জন্যে স্কুল করেননি। আমরা চাই—একদিন বাঙলা দেশে, শুধু বাঙলা দেশে কেন—ভারতবর্ষের মধ্যে এখানে এই ব্যাণ্ডেলে মেয়েদের একটা য়ুনিভার্সিটি গড়ে উঠুক—সামনের এই জমি দেখছেন—চারপাশের যা সব জমি দেখছেন, সব ইস্কুলের সম্পত্তি—সেক্রেটারি স্কুলের নামেই দিয়ে দিয়েছেন।

সুকুমারী বললে—সামনে অনেক ফাঁকা জমি পড়ে আছে দেখলাম।

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলে—হেড মিস্ট্রেসের নাম কি ?

—কমলাবালা দত্ত।

কমলা দত্ত সুকুমারীকে বলেছিল—ওই দেখুন ওইখানে হবে আমাদের দরবার-হল্—পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বড় বড় লোক এসে ওইখানে বক্তৃতা দেবেন। ভেতরে বড় বড় অয়েল পেন্টিং টাঙানো থাকবে শুধু মহিলাদের—পৃথিবীর যত মহীয়সী মহিলা, দময়ন্তী, লোপা-

মুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, সীতা, সাবিত্রী, ম্যাডাম কুরি, সিস্টার নিবেদিতা, সরোজিনী নাইডু—সকলের। আর ওই যে দেখছেন পুবদিকে খালি জায়গা পড়ে আছে, ওইখানে হবে কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স আর জুলজির ল্যাবরেটারি আর মিউজিয়াম—আপনারা আসুন। সেক্রেটারি বলেন—শিক্ষা মানে তো গোটা কতক শব্দ শেখা নয় শুধু, মানুষের হৃদয় মন মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তিগুলোর বিকাশের নামই প্রকৃত শিক্ষা। আমাদের সেক্রেটারিকে দেখলেন তো—মেয়েদের শিক্ষার জন্যে উনি কী চেষ্টাই না করছেন। এই এতটুকু একটা টিনের চালা থেকে আজ শুধু ওঁরই একার চেষ্টায় এই এতবড় হয়েছে। তাই চারদিকে এত নামডাক।

সুকুমারী বললে—কিন্তু সবাই যে বলছিলেন আপনার চেষ্টাতেই হয়েছে—

—আমার কথা ছেড়ে দাও ভাই। আমি কতটুকু জানি, কতটুকু পড়াশুনো করেছি। নিজের বাপ-মা তো ছিল না—পরের বাড়িতে থেকে···আপনার কে কে আছে ভাই বাড়িতে?

সুকুমারী বললে—আমারও নিজের বাপ-মা কেউ নেই। দূর সম্পর্কের কেবল মামা—মামীমা।

—তাহলে আপনার সঙ্গে আমার খুব ভাব হবে ভাই, আপনিও তো দেখছি বেশি বিলাসিতা পছন্দ করেন না—

সুকুমারী বললে—বিলাসিতা করবো যে পয়সা কোথায়?

কমলা দত্ত বললে—কেন, পয়সা থাকলেই বুঝি বিলাসিতা করতেন? ভালো করে ভেবে দেখবেন বিলাসিতার মধ্যে কোনও সুখ নেই, তা হলে যাঁদের নাম করলাম ওই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ম্যাডাম কুরি, জোয়ান-অব-আর্ক, সিস্টার নিবেদিতা ওঁরা সেবার পথ বেছে নিতেন না—তা ছাড়া মনের মতো কাজ পেলে তো মূর্খেরাও করতে পারে। তার মধ্যে আর বাহাদুরিটা কী? কিন্তু সব কাজকে নিজের মনের মতন কাজ করে তোলাই তো মহত্ত্বের পরিচয়।

অন্য টীচারদের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। সবাই বেশ হাসিখুশি।

বেশির ভাগই সুকুমারীর মতো দুস্থ। চালচলন পোশাক-পরিচ্ছদ সাদাসিধে।

একজন বললেন—চলে আসুন আপনি, এখানে তো হোস্টেল খরচ ফ্রি, খাওয়ার জন্যে শুধু মেসিং চার্জ দিতে হয়। তা কোনও মাসে তেরো টাকা কোনও মাসে পনেরো, তার বেশি নয়—আর এখানে বায়োস্কোপ থিয়েটারের তো বালাই নেই, শুধু রাস্তায় হেঁটে বেড়ানোর নিয়ম নেই এই যা—বেরোলে গাড়ি করতে হবে—আসুন আপনি, আপনার মা নেই, কমলাদি মায়ের মতন আদর করবেন—দেখবেন।

আবার একদিন সুকুমারী এল আদিনাথকে সঙ্গে নিয়ে। দরখাস্ত, তাও একদিন লিখে দিয়েছিল আদিনাথ। ইণ্টারভিউ, তাও আদিনাথ-কেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। এবারও স্যুটকেস বিছানা সব নিয়ে আদিনাথই পৌঁছে দিয়ে গেল। সুকুমারী বলেছিল—এতদূরে চাকরি হলো—তুমি আসবে তো ঘন ঘন?

আদিনাথ বলেছিল শুধু—আসবো বৈকি!

—মুখেই বলছো আসবো, আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি তো বাঁচলে—তোমাকে দূরে রেখে আমার মাঝে মাঝে কী ভয় যে হয়। সত্যি আসবে তো?

আদিনাথ বলেছিল—আসবো বৈকি। তবে তেমন ঘন ঘন আসতে পারবো না আর আগের মতো। মাসে দু'তিন দিন আসতে চেষ্টা করবো—

—না, শনিবার-শনিবার ঠিক আসা চাই কিন্তু—

—প্রত্যেক শনিবার যদি না-ই আসতে পারি, সামনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে তো হাতে, সেগুলো—

—যদি শনিবার-শনিবার না আসতে পারো তো আমি ঠিক চাকরি ছেড়ে দেবো এই তোমায় বলে রাখলুম। শেষে মামার বাড়ি গিয়ে আবার হাঁড়ি ঠেলবো সেই ভালো হবে?

আদিনাথ বললে—আবার সেই অশথগাছতলা থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে তুলে দিলাম সুকুমারীকে। কথা দিলাম শনিবার-শনিবার যাবো। কথা দিলেই যে কথা রাখতে হবে এমন প্রিন্সিপ্‌লে আমি কোনওদিন বিশ্বাস করিনি। তেমন দুর্নাম আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতেও দেবে না। তা সুকুমারীর ওপর তখন আমার যতটা আকর্ষণ ততখানি আকর্ষণ রমা, রমলা, সুতপা, সুপ্রীতির ওপরেও আছে। সুকুমারীর জন্যে যতটা সময় ব্যয় করি, ততটা সময় সকলকেই দিতে হয়। সকলের ওপরেই আমার সমান আকর্ষণ। কারোর ওপরই আমার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই তখন। সকলেই জানে আমি তারই একান্ত আপন। তার জন্যেই আমি চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। কিন্তু আজ বলতে দোষ নেই, সেদিন সুকুমারী অতদূরে 'হুগলী গার্লস স্কুলে' চাকরি নেওয়াতে আমি বিশেষ বিচলিত হইনি। বলতে পারা যায়—একটু সময় হাতে পাবো বলে, আর একটু মুক্তি পাবো বলে স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিলাম ভাই।

আদিনাথ আরো বললে—কিন্তু সুকুমারীর দিন ওখানে ভালোই কাটতে লাগলো—প্রথম প্রথম প্রতিদিনই চিঠি আসতো, নতুন ইস্কুলের কথা, নতুন চাকরির বিবরণ, চিঠি লিখতে কিম্বা বড় চিঠি লিখতে আমার যেমন আলসেমি সুকুমারীর তেমনি ঠিক উল্টো—

চিঠির মধ্যে পঞ্চান্ন ভাগ থাকতো কমলা দত্তর কথা। এমন মানুষ আমি দেখিনি—এই সব। কমলা দত্ত কী বলেছে, কমলাদি কী না বলেছে, কমলাদি কী ভালোবাসে, কী ভাবে। কী স্বপ্ন কমলা দত্তর সব।

সুকুমারী লেখে—অনেক ইস্কুলেই তো চাকরি করলাম, এমন হেড মিস্ট্রেস কিন্তু আর কোথাও দেখিনি। আমাদের কোনও কিছু ভাবতে হয় না—সব ভাবনা কমলাদির ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা সব টীচাররা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি। মাকে দেখিনি, দিদি কি ভাইও নেই আমার, বাপ-মা দূরের কথা, এক তোমার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে আদরও পাইনি জীবনে। কমলাদি যেন আমার সব দুঃখ মিটিয়েছে—তুমি

শনিবার এসো—কমলাদিকে দেখো—দেখলে তোমারও ভালো লাগবে এমন মেয়ে সত্যিই হয় না। সুকুমারী প্রতি চিঠিতে কমলা দত্তর প্রশংসায় পঞ্চমুখ একেবারে।

কিন্তু প্রথম কয়েকটা শনিবারে আদিনাথের যাওয়া হয়ে উঠলো না নানা কারণে। তখন কলেজ ছেড়ে দিয়ে সবে ব্যবসায় নেমেছে। এই ব্যবসার ওপরেই তখন আদিনাথের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাছাড়া অবসর কাটাবার জন্যে আর সবাই তো কলকাতায় রয়েছে। কেবল সুকুমারীই যা নেই। আর সুকুমারী চিঠি তো লেখেই, সুতরাং ব্যাণ্ডেলে যাওয়ার পরিকল্পনাটা কয়েক সপ্তাহ ঠেকিয়ে রাখা গেল।

প্রথমদিনেই সুকুমারীকে কমলা দত্ত বলেছিল—এখানে হোস্টেলে কিন্তু আমাদের একটু কড়াকড়ি আছে ভাই—

সুকুমারী বলেছিল—তা কড়াকড়ি থাকলে আমার কোনও আপত্তি নেই—

কমলাদি বলেছিল—হ্যাঁ, ওই যে যে-সে যখন ইচ্ছে টীচারদের বা ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে—তা হবে না। সেক্রেটারি সেটা পছন্দ করেন না কিনা। বলেন—মেয়েদের বোর্ডিং, তাই একটু সাবধান হতে হবে—তা তোমার লোক্যাল গার্জেন হিসেবে কার নাম লিখবো রেজিস্ট্রি খাতায়? বেশি লোকের নাম দিও না ভাই, ওতে কাজের বড় ব্যাঘাত হয়—আর তাছাড়া সকলেই তা হলে যার-তার নাম দিয়ে বসবে, তখন আর কাউকেই ঠেকানো যাবে না—

সুকুমারী বলেছিল—বেশি লোকের নাম পাবো কোথায় বলুন কমলাদি। আমিও তো বাপ-মা-মরা মেয়ে, নইলে কি বাড়ি ছেড়ে চাকরি করতে আসতে হয়—

কমলা দত্ত যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলো।

বললে—চাকরি বলছো কেন একে সুকুমারী। সংসার তো সবাই করে। সংসার করার মধ্যে যে কী সুখ তা তো দেখেছি, নিজে না

সংসার করে থাকি, সারাজীবন মা'র যে কী কষ্ট গিয়েছে তা তো মনে আছে। ধরে নাও না এটা আশ্রম, আমরা সবাই এখানে সেবা করতে এসেছি, ছাত্রীদের সেবা করবো, নিজেদের মনুষ্যত্ব লাভের দুঃসাধ্য সাধনা করবো—

আগেরদিন সেক্রেটারির কাছে শোনা কথাগুলো গড় গড় করে বলে যায় কমলা দত্ত।

কমলা দত্ত বলেছিল—টীচাররা সবাই বলছিল—যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। পাঁচ টাকা করে ডিয়ারনেস্ এলাউএন্স আরো বাড়িয়ে দিলে ওদের উপকার হয়—ছাত্রীদের মাইনে তো আমরা বাড়িয়েইছি—

সেক্রেটারি রামমোহন সেনের মাথার ওপরই স্বামী বিবেকানন্দর গেরুয়া পাগড়ি পরা মূর্তিটা ফ্রেমের মধ্যে বাঁধানো। কী তেজোদ্দীপ্ত চাউনি। নতুন যুগের নব-অবতার। কমলা দত্ত সেক্রেটারির মুখের দিকে একপলক চেয়ে দেখে নিলে। মনে হলো—সেক্রেটারির চোখ দুটোও যেন অমনি তেজব্যঞ্জক, অমনি বিদ্যুদ্‌গর্ভ, অমনি করুণা-উজ্জ্বল! ওই চেহারার কাছে যেন টীচারদের সামান্য পাঁচ টাকা ডিয়ারনেস্ এলাউএন্স বাড়াবার আর্জি এনে অপরাধ করলো সে। মনে হলো কেন সে এত সামান্য অজুহাতে এই মানুষের ধ্যান-গাম্ভীর্য ভাঙাতে এসেছে। যেন তার এতদিনের সমস্ত শিক্ষা ভুল, সব উপদেশ ব্যর্থ।

সেক্রেটারি বললেন—তুমি কী বললে কমলা?

কমলা দত্ত বললে—আমি কিছু বলিনি ওদের, শুধু বলছি সেক্রেটারির কাছে আমি পেশ করবো দরখাস্ত—তিনি যা করেন—

রামমোহন সেন মৃদু হাসলেন—। বললেন—আমি কিছু করতে পারবো না, কারণ ইস্কুল আমার একলার নয়। আমি সেক্রেটারি বটে, কিন্তু এ-প্রতিষ্ঠান সকলের, সমস্ত জনসাধারণের। আমি আছি বলতে পারো, তবে এর একটা কমিটি আছে, প্রতিষ্ঠানের ভালো-মন্দ উন্নতি-

অবনতি সব বিষয়ে তাঁরাই ঠিক করেন—কিন্তু তুমিও তো কিছু বলতে পারতে ?

বলে থামলেন সেক্রেটারি।

বললেন—বলতে পারতে না ?

কমলা দত্ত কিছু বুঝতে না পেরে মাথা নিচু করে বসে রইল শুধু।

সেক্রেটারি বললেন—অনেক কিছুই বলতে পারতে, বলতে পারতে—এ-প্রতিষ্ঠান একটা আশ্রমের মতন, এখানে আমরা সবাই সেবা করতে এসেছি, ছাত্রীদের সেবা করবো, নিজেদের মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা করবো, বলতে পারতে—এই মানুষের সংসারে আমরা অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছি। বিধাতার এত-বড় দানকে, এতবড় আয়োজনকে আমরা আমাদের ব্যর্থতা দিয়ে কখনও উপহাস করবো না। মানুষের যজ্ঞ-আয়োজনকে দূরে টেনে ফেলে রেখে নুন-তেল-মশলার সংসারের স্নিগ্ধ-বিশ্রামের মধ্যে ঘুমোবার চেষ্টা করবো না—পৃথিবীতে আর যে যা করে করুক, আর যে যা ভাবে ভাবুক, আমরা এখানে বিশ্ব-বিধাতার কাছে শান্তি চাইতে আসিনি, আরাম চাইতে আসিনি। আমরা কল্যাণ চেয়েছি—কিন্তু কল্যাণ চাইলে দুঃখকষ্টকে ভয় করলে তো চলবে না—কল্যাণ যে দুঃখের মুকুট পরেই উদয় হয় সংসারে···এ-সব কথা তুমি বলতে পারতে না ?

কমলা কথাগুলো শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়লো। মনে হলো একদিনেই যেন সে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে।

সেক্রেটারি বললেন—উঠছো যে ?

কমলা দত্ত বললে—আমি ওদের এই কথাগুলো বলিগে যাই—

কমলা দত্ত চলে এল। ওইটুকুই যথেষ্ট।

সেদিন ফার্স্ট ক্লাশের মেয়েদের পড়াতে পড়াতে কমলা দত্ত বললে—তোমাদের মতন আমিও একদিন ছোট ছিলাম, আমিও একদিন তোমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকেই পাশ করেছি। আমাদের এ-প্রতিষ্ঠান একটা সামান্য ইস্কুল-মাত্র নয়, এ আমাদের আশ্রম।

এখানে আমরা সবাই সেবা করতে এসেছি। দেশের দশের মানুষের সেবা করবো। নিজেদের মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা করবো। তোমরা ভালো করে ভেবে দেখো মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এই মানুষের সংসারে আমরা অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছি। বিধাতার এতবড় দানকে এতবড় আয়োজনকে আমরা আমাদের জীবনের ব্যর্থতা দিয়ে কখনও উপহাস করবো না। মানুষের কর্ম-যজ্ঞের আয়োজনকে দূরে ঠেলে ফেলে রেখে নুন-তেল-মশলার সংসারের স্নিগ্ধ-বিশ্রামের মধ্যে ঘুমোবার চেষ্টা করবো না—পৃথিবীর আর যে-যা করে করুক, আর যে-যা ভাবে ভাবুক, আমরা এখানে বিধাতার কাছে শান্তি চাইতে আসিনি কিম্বা আরাম চাইতেও আসিনি। আমরা কল্যাণ চেয়েছি। কল্যাণ চাইলে দুঃখকষ্টকে ভয় করলে চলবে না, কল্যাণ যে দুঃখের মুকুট পরেই উদয় হয় সংসারে এ-কথা তোমরা ভুলো না—তোমরা এ-প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেদিন বৃহৎ-পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবে সেদিন আমার আজকের এই কথাগুলো স্মরণ করো…

মেয়েরা বলে—বড়দিদিমণি এত চমৎকার পড়ায়—

আর একজন মেয়ে বলে—বড়দিদিমণি কী পাশ জানিস—এম-এ, বি-টি—চাট্টিখানি কথা নয়।

মাসে একবার করে কমিটীর মিটিং বসে। বসে সেক্রেটারির কাছারি ঘরে। আরো অন্যান্য সভ্যরা হাজির থাকেন তখন। হেড মিস্ট্রেস কমলা দত্তও নীরব সাক্ষী হিসেবে একপাশে বসে থাকে।

এরকম সভায় সাধারণত সেক্রেটারি রামমোহন সেন একাই একশো। তিনিই যা করবার করেন। কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করে নেন। খরচের স্যাংশন। জমা-খরচের খতিয়ান বা এমনি সব ব্যাপার। কিম্বা স্কুল-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোনও অভিযোগ অনুযোগের বিহিত করা।

সেক্রেটারি বললেন—আপনারা জানেন আমাদের এই গার্লস স্কুল শুধু মাত্র স্কুল নয়—একটা ভাবী বিরাট প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র বিভাগ মাত্র।

সরলবাবু সেকেলে ব্রাহ্ম ভদ্রলোক। একমুখ দাড়ি গোঁফ।

আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বসেছিলেন একপাশে। বললেন—তা তো বটেই—

সেক্রেটারি বললেন—আমাদের হুগলী জেলায় যে শিক্ষার বীজ আমরা রোপণ করেছি, তা থেকে আমার আশা আছে এ একদিন য়ুনিভার্সিটির মহীরুহ হয়ে গড়ে উঠবে। যুদ্ধের হ্যাঙ্গামে অনেকেই কলকাতা ছেড়ে এখন এখানে এসে উঠেছেন। আমাদের ছাত্রীসংখ্যাও আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় আমাদের স্থান-সংকুলনের জন্যে ইস্কুলের ঘরের কিছু সম্প্রসারণ করা দরকার হয়ে পড়েছে—সুতরাং আমি প্রস্তাব করি ছাত্রীদের বেতন-বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে—বিশেষ করে জিনিসপত্রের দাম যখন চারিদিকে বেড়েই চলেছে—

ললিতবাবু নিজে ব্যবসায়ী মানুষ। বললেন—দাম আবার বাড়েনি ? কাল সকালে তিনশ গ্রোস মাল কিনেছি সাড়ে বাইশ টাকা দরে আর সন্ধ্যেবেলা মশাই—বলা নেই কওয়া নেই—বারো আনা দাম বেড়ে গেল—আগে জানতে পারলে আরো বেশি কিনতাম মশাই—

সরলবাবু বললেন—শিক্ষার ব্যয় বাড়ালে কি ভালো হবে—একেই দরিদ্র গৃহস্থরা···আপনি কী বলেন কমলা দেবী ?

সেক্রেটারি বললেন—শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে যে-কথা উঠেছে, তার সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য আছে—আপনারা জানেন বাঙলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার জন্যে এখানকার মনীষীরা কী করেছেন··বিশেষ করে এই হুগলী জেলায়, কত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আজ স্ত্রী-শিক্ষার বহুল প্রচলন হয়েছে এখানে তা আপনাদের অবিদিত নেই—এর জন্যে যা-কিছু কৃতিত্ব সবই সেইসব প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের—

সরলবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে বললেন—রাজা রামমোহন রায়ের অবদানের কথা যেন আমরা ভুলে না যাই সেনমশাই।

সেক্রেটারি বললেন—সেই আদিযুগে যখন খৃস্টান মিশনারীদের অপচেষ্টার ফলে হিন্দুধর্ম লোপ পাবার উপক্রম হয়েছিল, তখন

রামমোহন রায়ের মতো ঋষিকল্প প্রাণ এসেছিলেন আমাদের উদ্ধার করতে—

সরলবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন—আর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন-এর কথাও বলুন ওই সঙ্গে—

তারকবাবু গলায়-মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে এতক্ষণ চুপ করে বসে-ছিলেন। কিছু বলা তাঁর স্বভাব নয়। কিন্তু আর থাকতে পারলেন না।

বললেন—কেন, বিদ্যাসাগর কি ফ্যাল্‌না নাকি মশাই—বিদ্যাসাগর কি বানের জলে ভেসে এসেছিলেন—

সরলবাবু উত্তেজিত হন না সহজে। এবারও হলেন না—

বললেন—বিদ্যাসাগর মশাই যা-ই করে থাকুন, গোড়াপত্তন তো করলেন রাজা রামমোহন রায় আর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—ব্রহ্মানন্দর 'ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ' পড়ে দেখেছি, আহা, কী মহাপুরুষই ছিলেন তাঁরা সব—

তারকবাবু বললেন—আপনি 'সীতার বনবাস' পড়ে দেখবেন তার চেয়েও ভালো লাগবে—শিক্ষা শিক্ষা যে বলছেন—বিদ্যাসাগর মশাই বই না লিখলে পড়তো কী মেয়েরা শুনি—

সেক্রেটারি থামিয়ে দিলেন। বললেন—তা যদি বলেন তো এই হুগলী জেলাতে ১৮০০ সালে বাঙলা দেশের মধ্যে শ্রীরামপুরেই প্রথম মহিলা-ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন একজন বিদেশিনী। তাঁর নাম শ্রীমতী হ্যানা মার্শম্যান—বাঙলা দেশে সেই-ই প্রথম গার্লস-স্কুল বলতে গেলে। কারো একক চেষ্টায় কোনওদিন কোন বড় জিনিসই হয়নি, হয়ও না—তা বলে কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়! এই যে আমাদের প্রতিষ্ঠান—এ কি আমারই একলার চেষ্টায় হয়েছে বলতে পারি? আপনাদের সকলের চেষ্টাতেই তো এর সার্থকতা—

ললিতবাবু বললেন—তা কী করে বলি, আপনি এই ইস্কুলের পেছনে কম করে দু'লক্ষ টাকা তো ঢেলেছেন। কে পারে বলুন তো আজকাল—দু'লক্ষ টাকা ব্যবসায় ঢাললে বেকসুর ডবল লাভ না করুন সেভেন্টি পারসেন্ট তো···

সেক্রেটারি বললেন—লাভ-লোকসানের কথা ভাবলে আমি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করতাম না—সে-প্রসঙ্গ আজকের সভায় অবান্তর, সে-যা হোক, আজ আর একটা বিষয় আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে চাই—আমাদের প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী একটা যুগ্ম-দরখাস্ত আমার কাছে পাঠিয়েছেন—বেতন বৃদ্ধি দাবী করে···আমি দরখাস্তটা পড়ি শুনুন—শুনে আপনারা যা বিবেচনা করেন বলবেন—

বোর্ডিং বাড়িতে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিল।

মনীষা সেন বললে—মাইনে যদি না বাড়ে তো কী করবো বল্ ভাই—চাকরি তো ছাড়তে পারবো না—

মাধুরী বললে—কেন, আসানসোল গার্লস ইস্কুলে গেলে এক্ষুনি আশী টাকা মাইনে হয়—

ইলা দত্ত বললে—সে বিজ্ঞাপন আমি দেখেছি, অঙ্ক, হিস্ট্রি, ইংরেজী সব পড়াতে হবে—খাটুনি নেই নাকি—তারপর কোচিং-ক্লাশ আছে না—

মনীষা সেন বললে—আর অতোদূর—আসানসোল কি এখানে ভাবছো ?

মাধুরী বললে—ব্যাণ্ডেলে এসেছি আর আসানসোল যেতে পারবো না—একবার যখন বাড়ি ছেড়েছি তখন যেখানে বেশি মাইনে পাবো সেখানেই যেতে রাজী আছি—

মনীষা সেন বললে—কিন্তু কমলাদির মতো এরকম হেড মিস্ট্রেস পাবে নাকি সেখানে ?

ইলা দত্ত বললে—আর কিছুদিন পরে তো আমাদের ইস্কুলও কলেজ হয়ে যাচ্ছে—তখন তো প্রফেসারও হয়ে যেতে পারি—

মাধুরী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—হ্যাঁ, কলেজ নয় শুধু, একেবারে য়ুনিভার্সিটি—

মনীষা সেন বললে—আমি বলছি য়ুনিভার্সিটি না হোক কলেজ হবেই—এই দেখে নিও—

সুকুমারী তখন সবে নতুন ঢুকেছে। কথাবার্তার রহস্যটুকু কিছুই বুঝতে পারলে না।

আলোচনার পর সবাই চলে গেলে সুকুমারী জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মনীষাদি, আপনি যে বললেন কলেজ হবে, কেন হবে ?

মনীষাদি বললে—হবে হবে—আর কিছুদিন থাকো বুঝতে পারবে—কেন হবে—

—বলুন না মনীষাদি, কেন হবে ?

—তবে শোনো—

মনীষাদি বললে—ওই কমলাদি, ওঁরই জন্যে একদিন এই ইস্কুল প্রাইমারী থেকে মাইনর ইস্কুল হয়েছে, তারপর একদিন মাইনর ইস্কুল থেকে আবার হাই ইস্কুল হয়েছে—এখন আবার হাই ইস্কুল থেকে কলেজ হবার কথা হচ্ছে—আর কমলাদি যদি ইস্কুল ছেড়ে দেয় তো এ ইস্কুলই উঠিয়ে দেবেন সেক্রেটারি—ওঁরই জন্যে তো এই ইস্কুল, আমাদের চাকরিবাকরি সব—যা কিছু এখানে দেখছো ভাই—সব। উনিই লক্ষ্য, আমরা এখানে কেবল উপলক্ষ্য মাত্র—

—কেন, ইস্কুল উঠিয়ে দেবেন কেন ?

সুকুমারী প্রথমটায় ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্তই উপলক্ষ্য, লক্ষ্য শুধু কমলাদি! কমলা দত্ত! কিন্তু সে-কথা আর শোনবার অবকাশ হলো না। মিটিং শেষ করে কমলাদি তখন ফিরেছে।

মাইনে অবশ্য সেদিন কারোরই বাড়েনি। যে ক'বছর সুকুমারী বিয়ের আগে পর্যন্ত ওখানে চাকরি করেছিল, সে-ক'বছরই উল্লেখযোগ্য মাইনে বাড়েনি। মাইনে বাড়াবার প্রশ্নতে বরাবর ব্যয় সঙ্কোচের কথাই উঠেছে।

কমলাদি বলেছে—ধরে নাও না আমরা সেবা করতে এসেছি এখানে, দেশের দশের সেবা, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা করতে এসেছি—তা ভাবতে পারো না—?

ছাত্রীদের ক্লাশে গিয়ে কমলা দত্ত সেদিন মিটিং থেকে এসে বক্তৃতা দিলে। বললে—একদিন এই বাঙলা দেশেই নতুন করে প্রথম স্ত্রী-শিক্ষার বীজ রোপণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। জনকয়েক বিদেশী মিশনারী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষেরা—কিন্তু শুনলে তোমরা হয়তো অবাক হয়ে যাবে, আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে বাঙলা দেশে এই হুগলী জেলার শ্রীরামপুরেই সর্বপ্রথম বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। সে ১৮০০ সালের কথা। সে-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন একজন বিদেশিনী। তাঁর নাম তোমরা মনে রেখো। তিনি হচ্ছেন সুবিখ্যাত পাদরী মার্শম্যান সাহেবের স্ত্রী শ্রীমতী হ্যানা মার্শম্যান—। এই হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেলেই আবার আর একদিন প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আমাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ-ও মনে রেখো···আজ যে তোমাদের আট আনা করে মাইনে বাড়লো—সেদিনের সেই গৌরবময় দিনের কথা ভেবে অন্তত আশা করি তোমরা এর জন্যে ক্ষুণ্ণ হবে না—তোমাদের বাবা-মা গুরুজনদের বুঝিয়ে বলবে এ-কথা··· তাঁরাও যেন আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যের সাহায্য এবং সহযোগিতা করেন।

ঠিক এমন সময়েই এই কাণ্ডটা ঘটলো।

আদিনাথ বললে—ঠিক এমনি যখন পরিস্থিতি, তখন এক শনিবারে সুকুমারীর চিঠি পেয়ে আমি হাজির হলাম গিয়ে হুগলী গার্লস হাই ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস কমলা দত্তর আপিস-রুমে।

ব্যাণ্ডেল স্টেশনে এর আগে বার দুয়েক মাত্র এসেছে আদিনাথ। প্রথমবার এসেছে সুকুমারীকে নিয়ে ইণ্টারভিউ-এর দিন। আর তারপর যেদিন প্রথম চাকরিতে জয়েন করলো সুকুমারী।

সুকুমারী লিখেছিল—বার বার করে লিখছি তবু তুমি আসছো না, এই শনিবার যদি না আসো তো আমি নির্ঘাৎ চাকরি ছেড়ে দেবো। আমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে তুমি যে আরাম করে গায়ে হাওয়া

লাগিয়ে বেড়াবে তা হবে না। নিশ্চয়ই আসবে বলছি, স্টেশনে নেমে একটা ঘোড়ার গাড়ির একেবারে যাওয়া-আসার ভাড়া ঠিক করবে—আমি তোমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে বেড়িয়ে আসবো…

সেদিনকার সেই গাড়োয়ানটা বোধহয় চিনতে পারলে। দুপুরের রোদে স্টেশনের চারপাশটা একেবারে টা টা করছে। শুধু অশথগাছ-তলাটায় একটু ছায়ার মতন।

হুগলী গার্লস হাই ইস্কুল সেই প্রথম চোখে দেখলে আদিনাথ। ছুটো তিনটে দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারদিকে লতানো গাছের বেড়া-ঘেরা পাঁচিল। প্রায় জেলখানার পাঁচিলের মতন উঁচু। সামনের লাল সুরকির পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়।

হেড মিস্ট্রেসের ঘরের সামনে শ্লিপ দিতেই ভেতর থেকে ডাক এল।

সুকুমারীর চিঠিতে কমলা দত্তর সম্বন্ধে আদিনাথের অনেক কিছুই জানা ছিল। কমলা দত্তর ঘরে ঢুকে আদিনাথের মনে হলো—কমলা দত্তকে যেন আগে দেখেছে অনেকবার। সেই বিরাট সেক্রেটারিএট টেবল্। পাশের র‍্যাকে সাজানো বই-এর পাহাড়। ও-পাশের দেয়ালে সিস্টার নিবেদিতার মস্ত একটি ছবি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিম্‌ছাম সাজ-সজ্জা। আর এই পরিবেষ্টনীতে সরল গম্ভীর একটু মোটাসোটা চেহারার চশমাপরা মেয়েটি যেন কমলা দত্ত না হয়েই যায় না।

আদিনাথ ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে কমলা দত্ত চোখ তুলে চাইলে।

বললে—আপনার নাম বুঝি আদিনাথ মুখোপাধ্যায়—

আদিনাথ বললে—হ্যাঁ—

কমলা দত্ত সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললে—বসুন—এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি সুকুমারীকে—

আদিনাথ বসেছিল। তারপর কমলা দত্ত একটা শ্লিপে কী যেন লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিল ভেতরে।

কমলা দত্ত বলেছিল—আমাদের এখানে ছাত্রী বা শিক্ষয়িত্রীদের বাইরে যাওয়া-আসা সম্পর্কে খুব কড়াকড়ি মেনে চলা হয়—

আদিনাথ বলেছিল—ভালোই তো—এই-ই তো ভালো—

কমলা দত্ত বলেছিল—তাতে আপনাদের সুবিধে। আর আপনাদের আত্মীয়া টীচার বা ছাত্রী যাঁরা এখানে থাকেন তাঁদেরও ভালো—পাড়াগাঁ জায়গা তো, তাই আমাদের সেক্রেটারি এ-বিষয়ে খুব স্ট্রিক্ট্—

আদিনাথ কি আর বলবে। শুধু বলেছিল—আজকাল একটু স্ট্রিক্ট্ হওয়াই ভালো বলে মনে হয় আমার নিজের—

কমলা দত্তর কথায় যেন কৈফিয়ৎ-এর সুর ছিল একটু। বলেছিল—না, অনেকে আবার এ-সব পছন্দ করেন না কিনা—তাই বলছি মেয়েদের নিয়ে ইস্কুল চালানোর অনেক বিপদ, একটু এ-দিক ও-দিক হলেই নানা কথা ওঠে—

সুকুমারী বোধহয় তৈরিই ছিল, শুধু স্লিপ যাওয়ার যা অপেক্ষা। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেক কথা হয়ে গেল কমলা দত্তর সঙ্গে।

আদিনাথ বলেছিল—সেদিক থেকে আপনাদের ইস্কুলের তো খুব সুনাম—

কমলা দত্তর হাতে কলম, আর সামনে অসম্পূর্ণ একটা চিঠিও পড়েছিল। এ-কথার উত্তরে কমলা দত্ত তার সেই চিঠিটাই আবার লিখতে শুরু করেছিল। যখন সুকুমারী এল তখন দেখলে আদিনাথ চুপ করে বসে আছে আর কমলা দত্ত চিঠি লিখতে ব্যস্ত।

—তা হলে আসি কমলাদি—

কমলা দত্ত বলেছিল—এসো ভাই, বেশি দেরি করো না যেন—তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো কিন্তু—

বাইরে এসে আবার ঘোড়ার গাড়িতে উঠলো দু'জনে।

সুকুমারী বললে—জানলাগুলো বন্ধ করে দাও—

—সে কি, দম্ আটকাবে যে—

—না, তা হোক, আমাদের ইস্কুলের এই নিয়ম—এইটুকু তো পথ—তারপর ট্রেনে উঠেই তো আবার খোলা-মেলা—তা কমলাদিকে দেখলে তুমি ?

আদিনাথ বলেছিল—দেখলাম—

—দেখলে তো জানি, কিন্তু কী রকম দেখলে ?

আদিনাথ হেসে উঠেছিল। বলেছিল—অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে তোমাদের কমলা দত্ত—'শঙ্খিনী'র পর্যায়ে পড়ে বোধহয়—

—শঙ্খিনী ? সে আবার কি ?

—শাস্ত্রমতে তো নারী চার রকমের, পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী আর হস্তিনী—তা তোমাদের কমলা দত্তকে হস্তিনী বলবো না—তুমি আবার রাগ করবে। শঙ্খিনী বলাই ভালো—পদ্যে আছে—

দীঘল শ্রবণ, দীঘল নয়ন
দীঘল চরণ দীঘল পাণি···

তারপর একটু হেসে আদিনাথ সেদিন বলেছিল—এ-সব লক্ষণ-গুলো তো দূর থেকেই মিলে গেল শঙ্খিনী মেয়ের সঙ্গে, কিন্তু···

সুকুমারী বললে—এই এত লক্ষণ মিলিয়ে তুমি বিচার করো নাকি—বাবা-বাবা—

আদিনাথ বলেছিল—লক্ষণ না মিলোলে চলে—মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রেই বলেছে—দেবা না জামন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ—লক্ষণগুলো মিললে তবু যা হোক একটু আঁচ করা যায়—

—তা ওইটুকুন সময়ে তুমি তো কান, চোখ, হাত, পা সবই দেখে ফেলেছো—আর কী লক্ষণ দেখলে ?

—আর যে-সব লক্ষণ আছে তা মেলাতে গেলে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশতে হয়, ওপর-ওপর দেখে হয় না—কিন্তু তা কী করে আর সম্ভব বলো ?—

মনে আছে, আদিনাথের কথা শুনে সুকুমারী সেদিন খুব রাগ করেছিল।

—তুমি দেখছি যা-তা, আর যার সম্বন্ধে যা-ই কিছু বলো না কেন কিছু বলবো না, কিন্তু কমলাদির সম্বন্ধে তুমি ও-রকম বলো না। জানো, অমন মেয়ে হয় না। আমর মা নেই, কিন্তু এখানে এসে মায়ের অভাব মিটিয়েছে কমলাদি। শিখাদি বিধবা বলে কমলাদি পর্যন্ত মাছ খায় না। এই এত বায়োস্কোপ সিনেমা হচ্ছে চারদিকে, সবাই তো যায়, কমলাদি গিয়েছে কোনওদিন! পান, সুপুরি, লবঙ্গ পর্যন্ত খায়

না। ওই মিলের শাড়ি আর ফিতে বাঁধা জুতো—আমরা সবাই মাইনে বাড়াবার জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু কমলাদি পাঁচ বছর আগেও যে-মাইনে পেতো এখনও সেই মাইনেই নিচ্ছে। কমলাদি বলে—কী হবে বেশি টাকা নিয়ে, আমার তো কেউ নেই যে, দেবো কাউকে—বরং ইস্কুল-ফাণ্ডেই জমা হোক। ইস্কুলের আয় বাড়লেই আমি খুশি—

ফিরতে ফিরতে কিন্তু রাত দশটা বেজে গেল। অনেকদিন পরে কলকাতা দেখা, অনেকদিন পরে আদিনাথের সঙ্গ-পাওয়া। সিনেমা দেখে রেস্টুরেন্টে খেয়ে-দেয়ে ফিরতে একটু দেরিই হবে বৈকি!

ফেরবার সময় সুকুমারী বললে—শনিবার-শনিবার এসো সত্যি, না এলে মোটে ভালো লাগে না আমার—

কমলা দত্ত বললে—তোমরা সবাই খেয়ে নাও ভাই, খেয়ে শুয়ে পড়ো গে—আমি পরে খাবো—সুকুমারীর জন্যে আমাকে তো বসে থাকতেই হবে—

মনীষা সেন, মীরাদি, ললিতাদি, মাধুরী, শিখাদি সবাই ন'টার পর খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লো।

সুকুমারী আসতেই কমলা দত্ত বললে—এই এত দেরি করে আসা হলো তোমার! এ-রকম দেরি করলে কিন্তু সেক্রেটারিকে আমি নিশ্চয়ই বলে দেবো—বলেছি না, এ-সব উনি পছন্দ করেন না। এতে প্রতিষ্ঠানের বদনাম হয়—

তারপর খেতে-খেতে কমলা দত্ত এক সময়ে বললে—তা এতক্ষণ কী করলি তোরা শুনি?

—কী আবার করবো কমলাদি, সিনেমা দেখলাম আর তারপর চা খেলাম দু'জনে—

—তা বলে এতক্ষণ! এত কী গল্প হলো রে তোদের?

—এই যত সব আজে-বাজে কথা আর কী, এখন সব মনেও নেই—

—তা আদিনাথবাবুর বাড়ির লোকে কিছু বলে না?

—ওমা, তারা কি কেউ জানে নাকি!

—কে কে আছে আদিনাথবাবুর বাড়িতে?

—সবাই আছে, বাপ-মা, ভাই-বোন, দাদা-দিদি, কে নেই? আর আমাদের কি আজকের আলাপ! আজ দশ বছর ধরে দু'জনে মিশি—

কমলা দত্ত বললে—দশ বছর ধরে মিশছো বটে কিন্তু কাজটা ভালো করছো না, এ-ও তোমায় বলে রাখছি—কোনো পুরুষের সঙ্গে কোনো যুবতী মেয়ের গোপনে মেশাই উচিত নয়। এর পরিণাম কখনও ভালো হয় না সুকুমারী—এই আমার কাছে শুনে রাখো।

সুকুমারী বললে—কিন্তু আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি কমলাদি!

কমলাদি বললে—কিন্তু প্রবৃত্তির বিকৃতি ঘটতে কতক্ষণ শুনি? যা আপাত-সুখ বলে মনে হচ্ছে তা যে পরিণামে কত ভীষণ তোমরা কল্পনাও করতে পারছো না। এত ছোট এত তুচ্ছ সুখের প্রতি তোমাদের কেন যে এত আকর্ষণ বুঝতে পারি না—একটা বড় আদর্শকে লক্ষ্য করে জীবন কাটাতে পারো না—তাই তো সেদিন পড়ছিলাম রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'বড়োর মধ্যে আমাদের বাস এই সত্যটি স্মরণ করবার জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আছে—'ওঁ ভূ র্ভু বঃ সঃ'—এই কথাটা ভুলে গিয়ে যখন আমি মনে করি তুচ্ছ ঘরের মধ্যেই আমাদের বাস, ছোট আরামের মধ্যেই আমাদের বাস, তখনই হৃদয়ের মধ্যে যত রাজ্যের উৎপাত জেগে ওঠে—যত কাম ক্রোধ লোভ মোহ…'

সুকুমারী চুপ করে রইল।

কমলা দত্ত বললে—ওই যে গাদা গাদা চিঠি আসে প্রায়ই তোমার নামে দেখি, ও বুঝি আদিনাথবাবুরই লেখা?

সুকুমারী বললে—ওর চিঠি না পেলে আমার কিছু ভালো লাগে না যে কমলাদি—

কমলা দত্ত খানিকক্ষণ একটু থেমে রইল।

তারপর বললে—আমি যদি তোমার মা হতুম সুকুমারী, আদিনাথ-বাবুর সঙ্গে মিশতে তোমায় আমি ঠিক বারণ করতাম—যাক্ আর কী বলবো—তোমার নিজেরই ভালোমন্দ বোঝবার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে—

রাত অনেক হয়েছিল। সে-রাতে আর বেশি কিছু বললে না কমলা দত্ত।

অনেকদিন পরে এ-সব কথা সুকুমারী আদিনাথকে বলেছে। সুকুমারী বলেছিল—জানো, কমলাদির কথা শুনে সেদিন রাত্রে আমারও কেমন মনে হলো যেন বড় অন্যায় করছি আমি। তোমার সঙ্গে এতদিন মিশছি, কই কেউ তো এর আগে এমন করে আমায় বারণ করেনি। নিজের মা ছিল না। মনে হলো—মা থাকলে তো এমন করে সত্যিই তোমার সঙ্গে মিশতে পারতাম না। মা থাকলে মা-ও তো ঠিক এমন করেই বারণ করতো—! কিন্তু কী আশ্চর্য মেয়ে বলো তো ওই কমলাদি! কমলাদি কি এই ইস্কুল এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু ভাবেনি কোনও-দিন! কোনওদিন কি কারো চিঠি পাবার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণে গুণে দিন রাত্তির ভোর করেনি! ভেবে কোনও কূলকিনারা পেতাম না।

সুকুমারী বলে—সত্যি এক-একবার ভেবে ভেবে অবাক হয়ে যেতাম। দিন-রাত ইস্কুল আর ইস্কুল! প্রতিষ্ঠান আর প্রতিষ্ঠান! ছাত্রীদের ভালো আর মন্দ, শিক্ষা আর উৎকর্ষ! চিঠি-পত্র আর ফাইল। কমিটী আর মিটিং। সেক্রেটারি আর এডুকেশন! ক্লান্তি আসে না! বিতৃষ্ণা আসে না!

কমলা দত্ত বলতো—সে কি রে, আমিও তো মানুষ, ক্লান্তি আসবে না, নইলে রাত্তিরে ঘুমোই কেন?

সুকুমারী বলতো—কখন ঘুমোও, কতটুকু ঘুমোও, আমরা জানিনে বুঝি?

—দূর বোকা মেয়ে—না ঘুমোলে বাঁচে মানুষ?

—তা আমরা যখন উঠি তখন তোমার তো আদ্দেক কাজ সারা হয়ে গিয়েছে দেখি—কখনই বা ঘুমোও আর কখনই বা ওঠো, কিছুই টের

পাইনে। কালোর-মা তাই তো বলে, বড়দিদিমণির দু'জোড়া চোখ আর বারোটা হাত, মিথ্যে বলে না সে—

কমলা দত্ত বলে—দু'জোড়া চোখ আর বারোটা হাত যদি থাকতো তো লোকে যে রাক্ষুসী বলতো—কালোর-মা অমনি—তবু তো এত কাজ করেও সেক্রেটারির কাছে রোজই বকুনি খেতে হয়—

—কেন ?

—আমার যদি বারোটা হাত হয় তো ওঁর তা হলে চব্বিশটা হাত, আর বারো জোড়া চোখ—অমন কাজের লোক আর দেখিনি ভাই। আমি যদি অমন হতে পারতুম ! এই তো সেদিন সেক্রেটারি বললেন—বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে কাজে তুমি একটু ঢিলে দিচ্ছো আজকাল কমলা।

কমলার সে-কথা আজও মনে আছে। প্রতিদিন যেমন ইস্কুলের রিপোর্ট দিতে যায় কমলা সেদিনও গিয়েছে।

সেক্রেটারি খাতা দেখতে দেখতে বললেন—এবার রেজাল্ট এত খারাপ হলো যে ?

কমলা দত্ত বললে—অঙ্কতে এবার অনেকে ফেল করেছে দেখছি—

—অঙ্ক কে পড়ান ?

—মনীষা সেন, আমাদের অনেকদিনের পুরনো টীচার।

—কিন্তু মাইনে বাড়াবার জন্যে তো এঁরাই সেদিন সবাই দরখাস্ত দিয়েছিলেন। এঁদের যদি কাজ করবার ইচ্ছেই না থাকে তো জোর করে আমরা ধরে রাখতে চাই না কাউকেই, এইটে তুমি ওদের বুঝিয়ে দিতে পারো না ?

এ-কথার উত্তর না দিয়ে কমলা দত্ত চুপ করে বসে রইল।

সেক্রেটারি আবার বললেন—সেদিন দেখেছিলাম—রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছেন ওঁরা। আমি তো বার বার করে বলে দিয়েছি যত-দিন আমাদের স্কুলে ওঁরা থাকবেন ততদিন আমাদের ইস্কুলের সব নিয়ম-কানুন মানতেই হবে—আমাদের এটা তো ঠিক ইস্কুল নয়। একে আশ্রম বলে ভাবতে হবে—আর এ-কাজকেও চাকরি মনে করলে চলবে না। তেমনভাবে যদি কাজ করতে পারো তো থাকো। আর নয়তো বলো

ইস্কুল আমি তুলে দিই।

বুকটা ছাঁত্‌ করে উঠলো কমলা দত্তর! সেক্রেটারি রামমোহন সেনের সামনে বসে থর-থর করে কাঁপতে লাগলো যেন সে। ইস্কুল তুলে দিলে সেক্রেটারির কী আসবে যাবে। কিন্তু কমলা দত্ত! এ-ইস্কুল কি কমলা দত্তর শুধু কর্মস্থল! শুধু মাসকাবারি মাইনে নেবার সম্পর্ক এর সঙ্গে! আজ যদি সেক্রেটারি মাইনে না দেন তবু যে এখানেই থাকতে হবে তাকে। সেক্রেটারিকে তার ভয়ও করে আবার সেক্রেটারির কাছে রোজ একবার করে না এলেও যেন অস্বস্তির সীমা থাকে না তার। মনে হয় সেক্রেটারির চোখের চাউনিতে যেন কোনও যাদু আছে। সেক্রেটারি যেন কোনও দুর্ভেদ্য জালে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করে রেখেছেন। অথচ এতদিনের অভ্যেস। এই দুঃসহ বন্ধনের মধ্যেই যেন কমলা দত্তর পরম তৃপ্তি। এ-বাঁধন যেন আর সে কাটাতে পারবে না। আজ যদি সেক্রেটারি তাকে এই ইস্কুলের দায়িত্ব থেকে মুক্তিও দেন তো কমলা দত্তর যেন আর চলে যাবার ক্ষমতাও নেই এতটুকু। কমলা দত্ত যেন অসহায়, নিঃসম্বল। এতদিন সেক্রেটারির সুদৃঢ় আশ্রয়ের মধ্যে থেকেও যেন তাই কমলা দত্ত চিরকাল নিরাশ্রয়।

আহ্লাদীমাসীমা এক-একদিন বলেন—ধন্যি মেয়ে বটে মা তুই—

কমলা দত্ত বলে—কেন, ধন্যি হতে যাবো কেন মাসীমা—

আমার জামাই সেদিন বলছিল, পুঁটির বর। বলছিল—এমন মেয়ে লাখে একটা মেলে না—ইস্কুলের মেয়েদের এত ভালোবাসেন উনি—

কমলা দত্ত বললে— অতো প্রশংসা করবেন না মাসীমা—পায়া ভারি হয়ে যাবে—

আহ্লাদী মাসীমা বললেন—না রে ঠাট্টা নয়—আমি বললাম—কমলা-মেয়ের ছোটবেলা থেকেই এমনি লেখাপড়ায় সখ। আমি তো দেখে আসছি, আমার পেটের ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই তো একসঙ্গে মানুষ অথচ আমার ছেলেমেয়েদের কারো লেখাপড়া কি হতে নেই!

সত্যিই বোধহয় নেশা আছে কমলা দত্তর। শুধু লেখাপড়ার ওপরেই যে নেশা তা নয়। ইস্কুলের ওপরও নেশা নয়। কাজের ওপরও তার নেশা নয়। নেশা অন্য জিনিসে।

মনে আছে মনীষা সেন একদিন সুকুমারীকে বলেছিল—জানো ভাই, এই ইস্কুলের জন্যেই কমলাদি আর কমলাদির জন্যেই এই ইস্কুল —সেক্রেটারিও কমলাদিকে কখনও ছাড়বে না আর কমলাদিও সেক্রেটারিকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না—

সেদিন এ-কথার মানেই বুঝতে পারেনি সুকুমারী।

কতবার কত ভালো ভালো জায়গা থেকে চাকরির ডাক এসেছে কমলা দত্তর। চন্দননগর কৃষ্ণভামিনী নারীমন্দির থেকে চিঠি এসেছিল তার কাছে। লোক এসেছিল চুঁচড়োর 'মহিলা শিক্ষা-সদন' থেকে। অনেকে অনেক প্রলোভন দেখিয়েছে। চন্দননগরে বড় বড় লোকের বাড়ি। গোন্দলপাড়ার মেয়েদের জন্যে নতুন ইস্কুল হলো। পালপাড়া বিবিরহাটেও ইস্কুল হলো। শুধু কি তাই, কলকাতা থেকেও তো কতবার ডাক এসেছে তার। সেক্রেটারির বন্ধু রায়বাহাদুর হরনাথ সেন, তিনিও কত অনুরোধ করেছেন।

প্রথম প্রথম এরা বলতো। এই মাধুরী, মনীষা, সবাই।

—যাও না কমলাদি, কলকাতায় গেলে তোমার অনেক মাইনে বাড়বে!

কমলা দত্ত বলতো—মাইনে চাইলে এখানেই বুঝি বাড়ে না—না?

সরলা বলেছিল—আপনি যে কী কমলাদি, আমরা যদি এমন চান্স পেতাম! আমাদের কেউ বলে না—

সুকুমারী তখন আসেনি। বলেছিল—তা সেক্রেটারি এ নিয়ে কিছু বলেননি?

কমলা দত্ত বলেছিল—সেক্রেটারিকে আমি এই নিয়ে কথা বলবো? —কী যে তুই বলিস সুকুমারী—তোরা হলে ওঁর সামনে ভয়ে কথাই বলতে পারতিস না—এতদিন ধরে যাচ্ছি তো ওঁর বাড়িতে, তা ছাড়া ছোটবেলা থেকে ওঁর বাড়িতেই একরকম মানুষ হয়েছি বলা যায়—কিন্তু

তবু আমারও ওঁর সামনে যেতে এখনও পা কাঁপে—বাড়ির ছেলেমেয়েরাই ওঁর সামনে ঘেঁষে না—তা আমি তো আমি—

তারপর থেমে বললে—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভারি দয়ামায়া ওঁর জানিস—

সুকুমারী বললে—চেহারা দেখে কিন্তু তা বোঝবার উপায় নেই কমলাদি—

—কিন্তু কী চেহারা দেখছিস তো—খাঁটি এরিয়ান চেহারা। চওড়া-চওড়া হাতের পাঞ্জা—মনে হয় ওই হাত দিয়ে যদি টিপে ধরেন তো গুঁড়িয়ে পিষে যাবো একেবারে—কিন্তু ওই চেহারার ভেতরেই নরম মনটা কোথায় যে লুকিয়ে আছে বাইরে থেকে কেউ টের পায় না—রোজই যাই ওঁর কাছে, রিপোর্ট দিতে যেতে হয় তো, কিন্তু দু'দিনের জন্যে যখন কোথাও যান উনি বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে—মনে হয় এত বোঝা বুঝি আর সইতে পারবো না—তারপর যখন ফিরে আসেন, সামনে গিয়ে দাঁড়াই, মনটা হালকা হয়ে যায়—অথচ শুনলে বিশ্বাস করবি না, আজ পর্যন্ত আমাকে একটা ভালো কথা পর্যন্ত বলেননি—ওঁর কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছি এমন একটা দিনের কথাও মনে পড়ে না—

সত্যি কতদিন সেক্রেটারির বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির বন্ধ দরজা-জানালার মধ্যে বসে অঝোর ধারায় কেঁদেছে কমলা দত্ত। বাইরের কেউ সে-কথা জানে না। এই যে ইস্কুলের জন্যে প্রাণ দিয়ে এত পরিশ্রম, বাইরে তার জন্যে যত সুখ্যাতিই হোক, সে-সুখ্যাতির এক কণাও ওঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

বরং কতদিন বলেছেন—তোমাকে দিয়ে আমার আর কাজ চলছে না কমলা—তুমি বরং চাকরি ছেড়ে দাও—

ছোটো মেয়ে মানু দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে বললে—মা, বাবা না কমলাদিকে খুব বকেছে, জানো—

আহ্লাদীমাসীমা বেলা ন'টা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছিলেন।

বললেন—তোর ও-সব কথায় কান দেবার দরকার কী রে মুখপুড়ি—

—সত্যি মা, আমি দেখেছি, কমলাদি কাঁদছিল—

দু'দিন পরে দেখা হতেই আহ্লাদীমাসীমা বললেন—কর্তা বুঝি তোমায় সেদিন খুব বকেছিল কমলা—ক'দিন তাই আসোনি বুঝি? মানু বলছিল।

প্রথমটা কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল কমলা দত্ত।

তারপর থমকে গিয়ে বললে—হ্যাঁ, উনি তো গুরুজনের মতো। উনি তো আমার ভালোর জন্যেই বলেন। আমি কিছু মনে করি না—

আহ্লাদীমাসীমা বললেন—সত্যি তোমার ভালোর জন্যেই তো বলেন মা। তোমার জন্যেই তো ইস্কুল হলো, তুমি পড়বে, লেখাপড়া করে বড় হবে, গন্যি-মান্যি হবে, সেইজন্যেই তো ইস্কুল, বড় করা—তোমাকে বড় করবার জন্যেই তো ইস্কুলকে আজ কলেজ করা হচ্ছে—

কমলা বলে—তা কি আর জানি না মাসীমা—

শুতে যাবার আগে সেদিন কমলা দত্ত সুকুমারীকে বললে—এত কথা বললাম বলে তোর খুব রাগ হলো তো?

সুকুমারী বললে—আর কারুকে বলো না কিন্তু কমলাদি—

—কাকে আর বলতে যাচ্ছি, আমার অতো সময় নেই ভাই। আমারও কি সাধ হয় না ভাই, হয় বৈকি। মনে হয় সিনেমায় যাই, ভালো ভালো শাড়ি গয়না পরি, তোদের মতো। মা'র সঙ্গে বাঘ-নিমুন্দিপুরে মানুষ হলে আমিও হয়তো তাই করতুম। কিন্তু যখন এই ব্যাণ্ডেলে এলুম তখন থেকে সেক্রেটারির কাছে থেকে থেকে ও-দিকে আর মন গেল না। মনে হয় ও-সব দু'দিনের, ওতে চোখ হয়তো ভরে কিন্তু বুক ভরে না—গীতায় আছে—'সর্ব ধর্মং পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই যে মেয়েদের সেবা করতে এসেছি, এই সেবাতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই আমি ভাই ধন্য হয়ে যাবো—জীবনে আমি আর কিছুই চাই না।

বললাম—তারপর?

আদিনাথ বললে—তারপর পরের শনিবার দিনও গেলাম। আবার সেই স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়ির যাতায়াতের ভাড়া করা, আর তারপর আবার সেই হুগলী গার্লস্ ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস-এর সঙ্গে দেখা করা।

সেদিনও ঠিক তেমনি কাজের মধ্যেই ডুবে ছিল কমলা দত্ত। ঘামে ভিজে কপাল। মিলের ফরসা শাড়িটা আঁটোসাঁটো করে গায়ে জড়ানো। একটা বেঁটে কলম নিয়ে কী যেন লিখছিল কমলা দত্ত।

আদিনাথকে দেখে বললে—ও, নমস্কার—বসুন—

তারপর একটু থেমে বললে—সুকুমারী কি আজও বেড়াতে যাবে নাকি আপনার সঙ্গে?

আদিনাথ বললে—সেইরকমই তো কথা আছে—আমাকে সুকুমারী চিঠি লিখেছে—

—চিঠি লিখেছে?

কেমন যেন অবাক হওয়ার মতো কমলা দত্তর মুখের ভাব। যেন হঠাৎ আশা-ভঙ্গ হাওয়ার মতো মুখ-চোখের চেহারা। কিন্তু তখুনি সামলে নিয়েছে নিজেকে। বললে—আমি ডেকে পাঠাচ্ছি—

যথারীতি ঝি গিয়ে খবর দিলে। আর সুকুমারী বোধ হয় তৈরিই ছিল। সেজেগুজে এসে হাজির হলো এক মুহূর্তে।

এসেই বললে—আসি তা হলে কমলাদি—

তারপর বাইরে যেতে গিয়ে একটু থেমে ফিরে আবার বললে—আমি আজকে ঠিক তাড়াতাড়ি আসবো কমলাদি, সেবারের মতো আর দেরি হবে না—

কমলা দত্ত সেই রকম মুখ নিচু করে কাজ করতে করতেই বললে—তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই তোমার সুকুমারী—তোমার যখন খুশি এসো—

গাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে আদিনাথ বললে—কমলাদি বুঝি রাগ করেছে তোমার ওপর?

সুকুমারী একটু গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর বললে—বোধ হয় রাগই করেছে—

—কেন, রাগ করলে কেন? কী করেছিলে তুমি?

সুকুমারী বললে—আমারই ভালোর জন্যেই অবশ্য বলেছিল—

তবু যেন আদিনাথ কিছু বুঝতে পারলে না।

সুকুমারী নিজেই হঠাৎ বললে—তোমার সঙ্গে এই যে শনিবার-শনিবার বাইরে যাই, এটা কমলাদি পছন্দ করে না—বলে—এই মেলা-মেশা—এগুলো নয়।

—ভালো নয়? তা তুমি কী বললে?

কমলাদি বললে—আমার মা থাকলেও এমনি বারণ করতো। অবশ্য কথাটা কি অন্যায় বলেছে কমলাদি? দশ বছর ধরে মিশছি, অথচ··· কিন্তু কমলাদি কী করে বুঝবে বলো। ওঁর তো কোনওদিকে মন নেই, জীবনে একটা সিনেমাও দেখেনি। ইস্কুল ছাড়া আর ওঁর কোনো স্বপ্নও নেই, এই যে এতদিন ব্যাণ্ডেলে ছোটবেলা থেকে আছে, কত বেড়াবার জায়গা আছে, কত দেখবার জিনিস আছে এখানে শুনেছি। গঙ্গার ধারে, পর্তুগীজদের পুরনো গীর্জা, জুবিলী ব্রীজ। আমরা না হয় নতুন এসেছি, কমলাদি এসব কিছ্ছু দেখেনি। শুধু কাজের মধ্যে কাজ বন্ধ-গাড়িতে করে সেক্রেটারির কাছে ফাইল নিয়ে যাওয়া, আর ইস্কুলে এসে ওই ঘরটিতে বসে নিজের কাজ করা—অদ্ভুত মানুষ সত্যি—

চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে সুকুমারী বললে—কমলাদি হয়তো এতক্ষণে পুজো করতে বসেছে—

আদিনাথ বললে—তুমি কি এতক্ষণ কমলাদির কথাই ভাবছিলে নাকি?

সুকুমারী বললে—না, তুমি জানো না, কমলাদি আমাকে কত ভালোবাসে, কীসে আমার ভালো হবে তাই কেবল ভাবে। আমারই মতো কমলাদিরও মা নেই কিনা—পরের বাড়িতেই মানুষ তো—

তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে বলে—তোমার কথাও কিন্তু জিজ্ঞেস করে কমলাদি—তোমার চেহারারও খুব প্রশংসা করে কিন্তু—

—তাই নাকি?

—তুমি কী পাশ, কী করো, কী খেতে ভালোবাসো, কত খুঁটিনাটি

সব। আমি কেবল তোমার কথা বলি তো—কমলাদি সব মন দিয়ে শোনে। কিন্তু বলে—কাজটা তোমার ভালো হচ্ছে না সুকুমারী—তোমাদের এ-ধরনের মেলা-মেশা বন্ধ করে দাও—এতে মঙ্গল নেই, এতে কল্যাণ নেই—

ফেরবার পথে ব্যাণ্ডেল স্টেশনে পৌঁছিয়ে দিয়ে আদিনাথ বললে—তা হলে আসছে শনিবার আর আসবো না তো ?

—ওমা, কেন ?

—ওই যে তোমার কমলাদি পছন্দ করে না আমার আসা—

সুকুমারী বললে—না না, মাথার দিব্যি রইল, তুমি নিশ্চয়ই আসবে —না এলে আমি মাথা কুটে মরবো কিন্তু—

সেদিনও কমলাদি বারান্দায় আলোটা জ্বলিয়ে একখানা বই পড়ছিল, আর সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুকুমারী হুড়মুড় করে গিয়ে হাজির হলো—বললে—তুমি রাগ করো নি তো কমলাদি—আজকেও দেরি হয়ে গেল ট্রেনের জন্যে, আমার কোন দোষ নেই।

কমলাদি বললে—আজো খেয়ে এসেছিস তো ?

সুকুমারী বললে—আজ শুধু চা খেয়েছি, ও খাওয়াতে চাইছিল, কিন্তু সেদিন তুমি রাগ করেছিলে বলে কিছুই খেলাম না—

—আর কী করলি ? কোথায় কোথায় গেলি ?

—কোথায় আর যাবো, সিনেমায় গেলাম, যেমন যাই, আর গল্প—

—এত কী গল্প করিস রে তোরা। এত কী কথা তোদের থাকে বল্ তো—!

খানিক থেমে কমলা দত্ত খেতে খেতে বললে—তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমারই কাজ সুকুমারী। আমি ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস। তোমাদের সকলের ভালো-মন্দের ভার আমারই ওপর, তোমাদের অসুখ-বিসুখ হলেও যেমন আমারই দেখা কাজ, এও তেমনি। এই ইস্কুলকে যদি আশ্রম বলে মনে করো তো কোনও অনাচার এখানে করো না—তোমাকেও আমি সাবধান করে দিচ্ছি ভাই—এ ভালো নয়, এতে

তোমার মঙ্গল হবে না। এই সামান্য সংযমটুকু তোমাদের নেই! তা হলে বড় বড় কাজ করবার শক্তি কোথায় পাবে তোমরা?

কিন্তু পরের শনিবারের দিন সুকুমারীও অবাক হয়ে গেল।

মনীষা সেন বললে—আজ বুঝি কোথাও যাবে তুমি কমলাদি?

মৈত্রী বললে—এ-শাড়িটা পরে কী চমৎকার যে তোমায় দেখাচ্ছে কমলাদি—সত্যি!

ললিতাদি বললে—এই রকম রোজ সাজগোজ করো না কেন কমলাদি? এই তো বেশ—

কমলাদি কিন্তু কিছু বুঝতে পারলে না।

—কেন, কী এমন বাহারে-শাড়ি পরেছি, পাড়টা একটু চওড়া, এই যা—তা তোদের যদি ভালো লাগে তো এই রকম শাড়িই পরবো এখন থেকে—ও-ও মিলের এ-ও মিলের—

যথা সময়ে আদিনাথ এল।

কমলা দত্ত সেদিনও একমনে কাজ করছিল। আগের দিন থেকে অনেক কাজ বাকিও পড়েছিল। সেক্রেটারি আগের দিনও ধমক দিয়েছিলেন। কোশ্চেন পেপারের জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলেন বহুদিন থেকে। সেদিন ফেটে পড়লেন। যা ইচ্ছে তাই বললেন। বললেন—দিন দিন তোমার এ কী হচ্ছে কমলা, আগে তো কাজ এমন ফেলে রাখতে না—

কমলা যেমন মাথা নিচু করে থাকে, তেমনি নিচু করেই রইল।

—আর না হয় তো কিছু দিন ছুটি নাও—

কমলা দত্তর মনে হলো তাকে চাবুক মারলেও এর চেয়ে বেশি আঘাত সে পেতো না।

সেক্রেটারি বললেন—ছুটিও নেবে না, কাজও ফেলে রাখবে, এতে আমার কাজ কী করে চলে বলো তো? তোমার তো সুখ্যাতি হয়েছে চারদিকে এখন। অন্য স্কুলে গেলে তোমায় আদর করে তুলে নেবে—যাও, সেখানেই যাও—দরকার নেই আমার তোমাকে।

শুধু চাবুক নয়। এবার মনে হলো সেক্রেটারি যেন সাপের মতো তার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে তাকে ছোবল মারছেন। অথচ আশ্চর্য, কমলা দত্তর মনে হলো, এ ছোবল নয়, এ-যেন আশীর্বাদ। বিষও তার কাছে যেন অমৃত। সেক্রেটারির কাছে দাঁড়িয়ে বকুনি খেতেও তার এত ভালো লাগে!

—ভালো আছেন?

হঠাৎ মুখ তুলে সামনে আদিনাথকে দেখে যেন এক মুহূর্তের জন্যে রাঙা হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো কমলা দত্তর মুখ।

বললে—ও, আপনি? বসুন, আমি ডেকে পাঠাচ্ছি—

সেদিন কী কারণে যেন সুকুমারীর আসতে অন্যদিনের চেয়ে একটু দেরিই হলো।

কমলা দত্ত কাজ করতে করতেই বললে—আজ কোন্ দিকে বেড়াতে যাবেন আপনারা?

এ-প্রশ্নের জন্যে আদিনাথ যেন তৈরি ছিল না। একটু অবাকই হলো প্রশ্নটা শুনে।

তারপর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললে—ট্রেনে চড়ে সাধারণত কলকাতার দিকেই তো আমরা যাই—

—আর সিনেমায় যান না?

আদিনাথ হাসলো।

—সুকুমারী বলেছে বুঝি সব?

তারপর আদিনাথের কী খেয়াল হলো। হঠাৎ বললে—কিন্তু আপনি তো ওকে বারণ করেছেন আমার সঙ্গে মিশতে—

হঠাৎ কমলা দত্তর চোখ-মুখ-কান আবার আরক্ত হয়ে উঠলো। কী যেন বলতেও যাচ্ছিলো কমলা দত্ত, এমন সময় সুকুমারী ঝলমল করে এসে হাজির হলো, আর বলা হলো না।

এসেই বললে—আসি তা হলে কমলাদি—

কতদিন আগে গল্প বলেছিল আদিনাথ আর কতদিন পরে আমি এ-গল্প লিখছি। সব ঘটনা গুছিয়ে বলতেও পারেনি সেদিন আদিনাথ।

আদিনাথ বলেছিল—পর পর ঘটনাগুলো মনেও নেই আজ। আর বয়েসও হয়ে গিয়েছে। সেদিন যা ভেবেছিলাম, যা অনুভব করে-ছিলাম, আজ সে-ভাবনাও শেষ হয়ে গিয়েছে, সে-অনুভূতিও ফুরিয়ে গিয়েছে।

তবুও উল্লেখযোগ্য যে-ঘটনাটা ঘটলো, সেটা এর পরেই।

ইস্কুলের সামার ভেকেশন এল। লম্বা ছুটি। সুকুমারী চিঠি লিখলে —আসছে শনিবার নিশ্চয় এসো। আমি স্যুটকেস গুছিয়ে বিছানা বেঁধে তৈরি হয়ে থাকবো।

সমস্ত ব্যস্ততা এই সময়েই প্রতি বছর থেমে যায়। মনীষা সেন যাবে তার দেশের বাড়িতে। শিখাদি যাবে দিনাজপুরে। মাধুরীদি যাবে কাকার কাছে। মাধুরীদির বাবা নেই। আর ললিতা সান্যাল যাবে তাজপুর। সেখানে নিজেদের বাড়ি।

কমলাদি বলে—তোরা সবাই যা—যদি সময় পাস চিঠি দিস দিদিকে—

সুকুমারী বলে—তুমি কোথাও যাও না কেন কমলাদি—

কমলাদি বলে—আমি চলে গেলে ইস্কুল কে দেখাশোনা করবে বল্?

—কেন? দারোয়ান, চাকর, সব তো রয়েছে আর সেক্রেটারি তো বাড়ির কাছেই রয়েছেন—তিনিই দেখাশোনা করবেন—যাবে তুমি কম-লাদি আমার মামার বাড়িতে?

—দূর পাগলী, আমি এ-ইস্কুল ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও সুখ পাবো না—তা তোরা যা-ই বলিস, সেক্রেটারি যদি আমাকে তাড়িয়েও দেন, তবু এখানেই আমাকে থাকতে হবে—এখানে মরতেও আমার সুখ, জানিস—

ক্লাশে ক্লাশে ছাত্রীদের কাছে গিয়েও সকলকে বিদায় দিয়ে এল কমলা দত্ত।

বললে—ছুটিতে তোমরা সময় অপব্যয় করো না কেউ। ছুটি বলে যেন কেউ আলস্যে সময় কাটিয়ে দিও না—স্বামী বিবেকানন্দর কথা

মনে রেখো। তিনি বলেছিলেন—শিক্ষা মানে কতকগুলো শব্দ শিক্ষা নয়। হৃদয় মনের শক্তিগুলোর বিকাশকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে। এইভাবে শিক্ষা পেলে তোমাদের মধ্যে থেকেই একদিন সঙ্ঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ-এর মতো মহীয়সী রমণীর আবির্ভাব হবে—তবেই দেশ বাঁচবে, দশ বাঁচবে—ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হবে—

আদিনাথও একদিন এসে সুকুমারীকে নিয়ে চলে গেল।

কমলা দত্ত বললে—এবার তো আপনারও ছুটি, অনেকদিন এদিকে আর আপনাকে আসতে হবে না—

বাক্স-বিছানা এসে হাজির হলো দরজার সামনে। সুকুমারী তখনও আসেনি।

আদিনাথ শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি কোথাও যাবেন না?

কমলা দত্ত শুধু মুখ নিচু করে বলেছিল—আমি ইস্কুল ছেড়ে কোথাও যাবো না—আমার ছুটি নেই।

তারপর সবাই চলে গেল একে একে। মনীষা সেন গিয়েছে তার দেশের বাড়িতে। শিখা গিয়েছে দিনাজপুরে। মাধুরী তার কাকার কাছে। আর ললিতা সান্যাল গিয়েছে তাজপুরে। আর সুকুমারী! সুকুমারী বসুও চলে গিয়েছে কালীঘাটে মামীমার কাছে। খাঁ-খাঁ করা দুরন্ত দুপুর। ও-দিকে গঙ্গার দিক থেকে কখনও কখনও হাওয়া এসে বিপর্যস্ত করে দেয় সারা ইস্কুল-বাড়ি। জানলা-দরজার পর্দায় লেগে সে-হাওয়া এখানে এসে এই ঘরগুলোর মধ্যে ঢুকে শুধু হা হা শব্দ করে আবার ফিরে যায়। কমলা দত্ত তখন হয়তো একমনে নিজের একটা সেমিজ সেলাই করছে। কিম্বা রোদে ভিজে চুলগুলো শুকোতে দিয়েছে। এক-একবার ফাঁকা বাগানের ভেতর গিয়ে দাঁড়ায়। একটা কাক মুখে ময়লা নিয়ে এসে বসতে যাচ্ছিলো বারান্দার রেলিঙ-এ,—হাত উঁচিয়ে তাড়িয়ে দিলে কমলা দত্ত। কেবল নোংরা করবার মতলব। এবার বর্ষার পর পুজোর ছুটিতে বাড়িটা রঙ করাতে হবে—জানলা-দরজাগুলোতে রঙ দিতে হবে। অনেক ভাবনা অনেক পরিকল্পনা কমলা দত্তর। আবার বিকেলের দিকে একবার এসে নিজের আপিস-রুমে বসে। সকালে আর বিকেলে একবার করে

আপিস-রুমে না বসলে যেন বেকার মনে হয় নিজেকে। মনে হয় যেন কাজে ফাঁকি দিচ্ছে সে। যেন সেক্রেটারির বিশ্বাসের অপমান করছে সে।

তারপর কোনও-না-কোনও কাজের ছুতোয় সেক্রেটারির বাড়ি গিয়ে হাজির হয়।

সেক্রেটারি বলেন—বসো—

তারপর হাতের কাজগুলো সেরে নিয়ে বলেন—এই দেখো য়ুনিভার্সিটি থেকে চিঠি এসেছে—

এগিয়ে দেন চিঠিটা। কমলা দত্ত প্রতিটি লাইন মনোযোগ দিয়ে পড়ে।

সেক্রেটারি বলেন—পড়লে ?

কমলা দত্ত ছোট্ট করে উত্তর দেয়—হ্যাঁ—

সেক্রেটারি বলেন—সুতরাং ছুটির পরই এ-আর-পি ক্লাশ বসবে। সপ্তাহে একদিন। শনিবারই ভালো। সকলকে বলে দিও—শনিবার দিন কোন টীচার যেন ইস্কুলের ক্লাশের পর বেরিয়ে না যায়—এ-আর-পি ক্লাশ কম্পালসারি—

বাড়ির ভেতরে গেলেই আহ্লাদীমাসীমা জিজ্ঞেস করেন—আজকে কী রান্না হলো রে তোদের ?

তারপর ঘোড়ার গাড়িতে উঠে আবার নির্জন ইস্কুলে ফিরে আসে। এসে পুজো-আহ্নিক আছে, নিজের পড়া আছে। একটা সাবজেক্টে এম-এ দিয়েছে। হিস্ট্রিতে এম-এ দেবে কিনা ভাবে। তারপর সারা বাড়িটার দরজা-জানলা পরীক্ষা করে তালা বন্ধ হলো কি খোলা রইল দেখে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে যায়।

পরদিনও ঠিক এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটলো প্রথম শনিবারটাতেই।

আপিস-রুমে বসে একটু-আধটু কাজ দেখছিল কমলা দত্ত, হঠাৎ সামনে চেয়ে যেন ভূত দেখলে।

—নমস্কার।

—এ কি, আপনি যে ? কমলা দত্ত সত্যি চমকে উঠেছে।

তারপর হঠাৎ বললে—কিন্তু সুকুমারী তো কলকাতায়!

আদিনাথ বললে—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে পড়লো—

কমলা দত্ত বললে—আমাদের সামার ভেকেশন চলছে, খেয়াল ছিল না বুঝি?

আদিনাথ বললে—মনে পড়লো আপনি বলেছিলেন সামার ভেকেশনের ছুটিতে এখানেই থাকবেন—

কমলা দত্ত বললে—হ্যাঁ, আমি সামার ভেকেশনের সময় বরাবর এখানেই থাকি—

—খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে না বাড়িটা?

—এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে,—আর আমার যাবারও তো কোনও জায়গা নেই—

আদিনাথ এ-কথার পর আর কোন্ কথা পাড়বে বুঝতে পারলে না।

কমলা দত্তই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলে।

বললে—সুকুমারী কেমন আছে?

আদিনাথ বললে—ভালোই, তার সঙ্গে এখন আর তেমন দেখা হবার সুবিধে নেই—

—কেন?

আদিনাথ বললে—আমাদের মেলামেশা তো প্রকাশ্যে হয় না তেমন—আর মামার বাড়িতে সারাদিন সংসারের কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে—ফুরসুৎ হয় না। আর এই ইস্কুল খুললেই তখন আবার শনিবার-শনিবার দেখা হবে এখানে—

এর পর আর কোনও কথা হয় না। অনেকক্ষণ অস্বস্তিতে বসে বসে অস্থির হয়ে ওঠে কমলা দত্ত। আদিনাথ লক্ষ্য করে। লক্ষ্য করে নিজেই বিব্রত বোধ করে যেন। বলে—এবার আমি উঠি তা হলে—

—সে কি, সে কি হয়, এতদূর এলেন—

তারপর বলে—দাঁড়ান একটু, আমি কালোর-মাকে বলে আপনার একটু জল-খাবারের ব্যবস্থা করি গে—

আদিনাথ বলে—না না, আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—দেড়টার

ট্রেনেই আবার যাবো—

বলে সত্যি সত্যিই প্রায় বাড়ায় বাইরের দিকে। আদিনাথের মনে হয় —যাবার সময় কমলা দত্ত একবার অন্তত আসতে বললেও যেন ভালো হতো—।

কমলা দত্ত বললে—এলেনই যদি তো একটু বসে জিরিয়ে গেলে পারতেন—

আদিনাথ বললে—আমি তো ঠিক এখানে আসবো বলে আসিনি —হঠাৎ মনে পড়লো আপনার কথা তাই—

কমলা দত্ত আর কী বলবে ভেবে পেলে না। তার তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

আদিনাথ তখন বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কমলা দত্ত আর একবার আসতেও বলছে না তো! গাড়িতে উঠতে গিয়েও যেন একটু দ্বিধা করতে লাগলো আদিনাথ। অকারণে দরজা খুলতে দেরি করলো। আস্তে আস্তে একটা পা গাড়ির পা-দানিতে রাখলো। তখনও কমলা দত্ত দরজায় তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। মুখের চোখের ভাবে কোথাও নিমন্ত্রণের অনুরোধ কি তার ইঙ্গিতটুকু পর্যন্ত নেই।

আদিনাথের গাড়ি ছাড়বে-ছাড়বে। আর দেরি নেই। সহিস লাগামে টান দিয়েছে।

কমলা দত্ত হঠাৎ ক্ষীণ অনুযোগের সুরে বললে—আমার কিন্তু ভারি অন্যায় হলো—

আদিনাথ ইঙ্গিতে গাড়ি থামাতে বললে।

তারপর বললে—কীসের অন্যায় বলছেন—?

—আপনি এতদূর এসে একটু জল পর্যন্ত মুখে দিলেন না—ভারি অন্যায় হলো আমার—

আদিনাথ বললে—তাতে কি—এ তো আপনার নিজের বাড়ি নয়। আপনার বাড়ি গেলে তখন পেটভরে মিষ্টিমুখ করবো কথা দিলাম—

তারপর আদিনাথ বোধ হয় সহিসকে গাড়ি ছাড়বার ইঙ্গিত করতেই যাচ্ছিলো···হঠাৎ কমলা দত্ত এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলো।

কমলা দত্ত বললে—সুকুমারী জানে আপনি এখানে আসবেন ?

—কে ? সুকুমারী ?

আদিনাথ হাসলো। বললে—আমি কি নিজেই জানতাম আজ আমি এখানে আসবো ? না আশা করেছিলাম আপনিই আজ আমার সঙ্গে এমন মিষ্টি ব্যবহার করবেন !

মিষ্টি ব্যবহার ! কথাটা খট্ করে বাজলো কমলা দত্তর কানে। হঠাৎ মুখ দিয়ে তার কোন কথাও বেরুলো না।

আদিনাথ এবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলে।

বললে—না, আপনিই তো একদিন সুকুমারীকে আমার সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিলেন কি না—তাই বলছি—

এ-কথাতেও কোনও জবাব নেই কমলা দত্তর মুখে। তেমনি নিস্পন্দ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল কমলা দত্ত আদিনাথের মুখের দিকে চেয়ে। কী জবাবই বা সে দিতে পারতো!

—আচ্ছা, তা হলে আসি এখন, ট্রেনের টাইম হয়ে গেল আমার—বলে সহিসকে ইঙ্গিত করতেই গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

কমলা দত্ত তখনও তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল।

গাড়ির জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে আদিনাথ চিৎকার করে একবার শুধু বললে—আর-একদিন আসবো আবার—নমস্কার—

আর একদিন মানে যে ঠিক পরের শনিবারেই তা কমলা দত্ত কল্পনাও করতে পারেনি।

কালোর-মা হঠাৎ ঘরে এসে বললে—বড়দিদিমণি, সেই সেদিনকার সেই বাবু এসেছেন—

—কী বললি ?

কালোর-মা বললে—ওই সেদিন যে-বাবু এসেছিলেন, তিনি—

ভিজে চুলগুলো মাথায় গুছিয়ে নিতে নিতে কমলা দত্ত বললে—তুই আপিস-ঘরের দরজা খুলে দে—আমি যাচ্ছি—

তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—আর দেখ—

কালোর-মা ফিরলো।

কমলা দত্ত বললে—দোকান থেকে এক টাকার মিষ্টি নিয়ে আয় তো—আমি কাপড়টা বদলে এখুনি আসছি—ঘরে বসতে বলিস—

শাড়িটাকে আঁটো-সাঁটো করে গায়ে এঁটে পরিপাটি করে এসে আপিস-ঘরে দাঁড়ালেন কমলা দত্ত।

আদিনাথ দাঁড়িয়ে উঠে হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে বললে—আপনাকে কথা দিয়েছিলাম আসবো, দেখুন, কথা রেখেছি কিনা—

কমলা দত্ত কী উত্তর দেবে ভেবে উঠতে পারলে না। পুরুষদের সঙ্গে মেলা-মেশা বেশি নেই কমলা দত্তর। বিশেষ করে এ-ধরনের পুরুষদের সঙ্গে। ইস্কুল-কমিটীর মেম্বর যে-ক'জন তাঁদের সঙ্গে মিশতে হয় অবশ্য। ব্রাহ্ম সরলবাবু, তারকবাবু, ললিতবাবু সবাই প্রায় বৃদ্ধ। তাও তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তার বিষয়বস্তুও আলাদা। আর কী-ই বা কথা বলে সে কমিটীর সভায়। যা কিছু বলেন তা তো সেক্রেটারিই। তিনি একাই একশ! আর এই আদিনাথ! সুকুমারীর কাছে এর সম্বন্ধে অনেক কিছুই যে শুনেছে সে।

আদিনাথ বললে—ওঃ, সেদিন আপনার কথা অমান্য করার ফল হাতে হাতে ফলে গেল—জানেন—

কমলা দত্ত বললে—কী কথা?

ঠিক মনে পড়লো না তার কোন্ কথার উল্লেখ করছে আদিনাথ—

আদিনাথ বললে—ওই যে আপনি মিষ্টিমুখ করতে বলেছিলেন, আমি শুনিনি—আপনার কথা অমান্য করার ফল ফলতে পুরো আধ-ঘণ্টাও লাগলো না—

—কী রকম!

আদিনাথ বললে—ট্রেনে উঠেছি, বাড়ি যেতে হবে সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে, জরুরী কাজ ছিল—হঠাৎ কিছু দূর গিয়েই মাঠের মধ্যে ট্রেন গেল আটকে, আর চলে না—খবর নিয়ে জানলুম সামনে কোথায় নাকি মাল-গাড়ির ইঞ্জিন পড়ে গিয়ে রাস্তা বন্ধ—আর চলবে না গাড়ি, ত্রিশঙ্কুর

মতন সেখানেই ঝুলতে লাগলুম—

কমলা দত্ত কপালে চোখ তুলে বললে—তারপর—

—তারপর না এক কাপ চা, না একটা সিগারেট—পাক্কা সাড়ে সাত ঘণ্টা ওখানেই বসে, যখন বাড়ি পৌঁছলুম তখন রাত বারোটা কাবার—শরীরেরও তখন প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছে—

কমলা দত্ত সহানুভূতিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

—ছি, ছি, কী দুর্ভোগ বলুন তো!

আদিনাথ বললে—আজ কিন্তু এখানে মিষ্টিমুখ না করে আর উঠছিনে। আজো যদি আবার ট্রেন আটকে যায় তো মহা সর্বনাশ হবে। সন্ধ্যের আগে কলকাতায় আমার পৌঁছুনো চাই-ই—চাই—

কমলা দত্ত বললে—আগে তো একটু বিশ্রাম করুন, আজো তো এসেই যাওয়ার কথা তুলছেন—

আদিনাথ বললে—আপনার কী বলুন, আপনার তো ছুটি, হাতে কাজ থাকলে আমি আবার মন খুলে আড্ডা দিতেও পারিনে—

কমলা দত্ত বললে—সুকুমারী বলতো বটে আপনি নাকি খুব কাজের লোক, কাজ থাকলে ওর সঙ্গে দেখা করতেও নাকি ভুলে যান—

কালোর-মা মিষ্টি এনে দিয়েছিল।

আদিনাথ একটা মিষ্টি মুখে পুরে দিয়ে বললে—কাজের লোক কি আপনিও কম নাকি—সুকুমারী আমাকেও সব বলেছে আপনার সম্বন্ধে—

কমলা দত্ত বললে—কাজের লোক না ছাই—সুকুমারী আমাকে ভালোবাসে তাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছে বোধহয়—

আদিনাথ বললে—সত্যি বলছি, সুকুমারী আপনার খুব প্রশংসা করে। কমলাদি বলতে অজ্ঞান, এত প্রশংসা আমি ওর মুখে আর কারোর শুনিনি—

—সুকুমারী তো আমার কাছে আপনারও প্রশংসা করে।

আদিনাথ হো হো করে হাসতে লাগলো। বললে—সে করে আমি পুরুষমানুষ বলে, কিন্তু এক মহিলা আর অন্য এক মহিলার প্রশংসা

করছে এমন ঘটনা তো সংসারে বড় একটা দেখা যায় না। আসলে ওর কাছে এত প্রশংসা শুনেই তো আজ আপনাকে আমার দেখতে আসা—

কমলা দত্ত যেন লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেল কথাটা শুনে। হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিলে। কপালে একটু একটু ঘাম দেখা গেল।

তারপর নিজের মনেই যেন বলতে লাগলো—না না, কাজের লোক আমি সেটেই নই—কাজ করি বটে কিন্তু কাজের লোক হতে পারি না কিছুতেই—সাধ করে কি বকুনি খাই—

—বকুনি খান? বারে, বেশ তো—কার কাছে বকুনি খান?

—সেক্রেটারির কাছে, আপনি চেনেন না তো তাঁকে, অদ্ভুত কাজের লোক উনি—ওঁর কাজ করবার ক্ষমতা দেখে আমিই অবাক হয়ে যাই, মানুষ একলা একদিনে এত কাজও করতে পারে!

সেক্রেটারির প্রসঙ্গ উঠতেই কমলা দত্ত যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল এক নিমেষে। মুখের চেহারা বদলে গেল। হঠাৎ সাপ দেখলে যেমন মুখের চেহারা হয় এও যেন তেমনি। আদিনাথ যত হঠাৎ সহজ করে দিয়েছিল ইস্কুলের গম্ভীর আবহাওয়াটাকে, ঠিক তত হঠাৎই সব যেন বানচাল হয়ে গেল। কমলা দত্ত যেন আবার হেড মিস্ট্রেসে রূপান্তরিত হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে।

আদিনাথ বললে—তা হলে আজ উঠি আমি—

কমলা দত্ত মুখ তুললে। বললে—কেন, হঠাৎ—

আদিনাথ বললে—আপনার কাজের ক্ষতি করছি, সেক্রেটারিমশাই টের পেলে হয়তো···

কমলা দত্ত বললে—তিনি তো নেই এখানে—

—নেই!

—কলকাতায় গিয়েছেন, কাল সন্ধ্যেবেলা ফিরবেন।

একটু থেমে বললে—ইস্কুলের জন্যে কয়েকটা কাজ আছে তাঁর কলকাতায়। আমাদের ইস্কুলের কিছু ফার্নিচার দরকার—আর য়ুনিভার্সিটিতেও কাজ আছে, সব শেষ করে তবে ফিরবেন।

আদিনাথ বললে—যাক, শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, তা হলে আর

ভয় নেই—কী বলেন—

—আমাদের সেক্রেটারিকে আপনি বুঝি খুব ভয় করেন ?

—তা করি, আপনাদের এখানে যদি কাউকে ভয় করতে হয় তো সে আপনাদের সেক্রেটারিকেই করি—

কমলা দত্ত বললে—আর সুকুমারীকে ? সুকুমারীকে ভয় করেন না ?

আদিনাথ কেমন যেন অবাক হলো।

—কেন, সুকুমারীকে ভয় করতে যাবো কেন বলুন তো ?

কমলা দত্ত এবার যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললে—সুকুমারীকে যদি ভয় না করবেন, তবে সেদিন যে এখানে এসেছিলেন সুকুমারীকে জানাননি কেন !

আদিনাথ যেন আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—আমি জানিয়েছি কি না তা আপনি জানলেন কী করে ?

কমলা দত্ত বললে—আমি জানি—এবং আজও যে এসেছেন তাও তাকে নিশ্চয় জানাননি !

আদিনাথ বললে—আমি জানাইনি স্বীকার করছি—কিন্তু তাকে জানালেই কি আপনি খুশি হতেন ?

কমলা দত্ত বললে—তাকে না জানালেই আমি খুশি হবো, এ-ধারণা আপনার কেমন করে হলো তাই আগে আমাকে বলুন—আমার কথা আমি পরে বলবো—

আদিনাথ আমতা আমতা করে বললে—আমি ভেবেছিলাম আপনি সে-ধরনের নন—

—কোন ধরনের ?

—অর্থাৎ মেয়েরা যে-ধরনের হয়ে থাকে সেই ধরনের। মানে, অন্য কোন মেয়ের মতোই আপনি নন—

—তার মানে ?

এবার আদিনাথ আর কোনও উত্তর করতে পারলে না।

কমলা দত্ত এবার সত্যি সত্যিই হেসে ফেললে। বললে—আমি কী

ধরনের মেয়ে, না-হয় ভেবেই বলুন—আপনাকে আমি ভাবতে সময় দিলাম। আপনি ভাবুন বসে বসে, তারপর বলবেন—

কিন্তু ভাবতে আর হলো না আদিনাথের। কমলা দত্তর মুখে হাসি দেখেই ঠিক উত্তরটা মনে এসে গিয়েছে তার। বললে—আপনাকে সাধারণ মেয়ের মতো ভাবতে আমার সত্যি খারাপ লাগে কমলা দেবী—মনে হয় আপনি যেন অনেক উঁচুতে—ঘর-সংসার তেল-নুন-মশলার কথা ভাবা যেন আপনার পক্ষে শোভা পায় না। এ-ইস্কুল তো ছোট, এ প্রতিষ্ঠান যদি আরো বড় হয়, য়ুনিভার্সিটি হয়, তারও মাথার ওপর থাকলে যেন আপনাকে মানায়—

কালোর-মা হঠাৎ ঘরে ঢুকলো। বললে—বড়দিদিমণি, কলে জল এসে গিয়েছে—

কমলা দত্ত এতক্ষণে যেন সচেতন হয়ে উঠলো।

আদিনাথ বললে—আমি এবার বরং উঠি—

কমলা দত্ত বললে—না না, বসুন—আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে কখন যে বিকেল হয়ে গিয়েছে টেরই পাইনি—

আদিনাথ বললে—মিছিমিছি আপনার সময় নষ্ট করে দিলাম খানিকটা—

কমলা দত্ত বললে—ছি, ও-কথা বলবেন না—কাজ করতে ভালো-বাসি বলে কি সারাদিন কাজই ভালো লাগে কারো ? আপনি এলেন তবু যাহোক একটু গল্প করা গেল—কত বছর পরে যে এমন গল্প শুনলুম তার ঠিক নেই—

আদিনাথ বললে—সত্যি আপনাকে দেখলে আমার হিংসে হয়—আপনার মতো যদি কাজ করবার ক্ষমতা পেতাম—

কমলা দত্ত বললে—অতি প্রশংসা নিন্দেরই নামান্তর, জানেন তো ?

আদিনাথ বললে—আপনার সামনে বলেই নয়, সুকুমারী আর আমি, দু'জনেই আপনার আড়ালেও প্রশংসা করি—

কমলা দত্ত আবার হাসলে। বললে—প্রশংসা শুনে শুনে আমার কান ঝালা পালা হয়ে গেল আদিনাথবাবু, বরং নিন্দে শুনতেই আমার ভালো

লাগে—তাই তো নিন্দে শুনতে আর বকুনি শুনতেই সেক্রেটারির কাছে রোজ যাই আমি—

আদিনাথ বললে—আপনার নিন্দে যে করে তাকে ধিক্—

কমলা দত্ত বললে—তিনি অবশ্য আমার ভালোর জন্যেই বলেন। বলেন—ঘর-সংসার গৃহস্থালী তো সবাই করে কমলা, ওর জন্যে যথেষ্ট লোক আছে। দেশের সেবা করবার লোক ক'জন পাবে? আমি ভাবি—আমি কতটুকুই বা মানুষ, কী-ই বা আমি জানি, আর কী-ই বা আমার সামর্থ্য—তবু চেষ্টা করছি—যতটুকু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা হয়—

তারপর একটু থেমে বললে—এই তিরিশ বিঘে জমি—এ-সবটাই সেক্রেটারির দেওয়া। এখনও অনেক জমি খালি পড়ে আছে—আপনি ভেতরটা দেখেছেন?

আদিনাথ বললে—না—

—আসুন না, আপনাকে দেখাই—

বলে চেয়ার ছেড়ে উঠলো। উঠে বললে—আসুন—এখন তো ইস্কু-লের ছুটি—অন্যসময় বাইরের পুরুষমানুষরা এদিকে বিশেষ আসতে পায় না—

আঁটো-সাঁটো দেহটা নিয়ে কমলা দত্ত অন্য দরজা দিয়ে ভেতরের উঠোনে এসে দাঁড়ালো। আদিনাথও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কমলা দত্ত আঙুল দিয়ে দেখালে।

—ওই যে একতলা বাড়িটা দেখছেন, ওইটেই আমাদের আদি বাড়ি। ওইখানেই আগে প্রাইমারী ইস্কুল ছিল। সে আদ্যিকালের কথা। আমি এইখান থেকেই পাশ করি, তারপর ওই পাশের দোতলা বাড়িটা হয় মাইনর ইস্কুল, তারপর এই তিনতলা বাড়িটা এখন নতুন হাই ইস্কুল হয়েছে।

আদিনাথ চারদিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল। ভেতরে এত জায়গা। এত বিরাট সাজানো গাছপালা। কমলা দত্তর নিজের শরীর-টার মতো সমস্ত পরিবেশটাই আঁটোসাঁটো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কমলা দত্ত বললে—ওই যে ওদিকে দেখছেন পুকুরের পাশে খানিকটা খালি জায়গা, আমাদের প্ল্যান ওইখানে আমাদের মেয়েদের জন্যে ফিজিকাল কালচারের ঘর হবে—আর তার পাশেই হবে নতুন বাড়ি, কলেজ হলে ওইখানে হবে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটারি আর মিউজিয়াম যা কিছু বলুন—

তারপর আর একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—আর ওই যে মধ্যেখানে একটা ফাঁকা মাঠ দেখছেন, ওইখানে হবে একটা হল্—মিটিং-টিটিং হবে—কেউ বিখ্যাত লোক এল তো ওখানে বক্তৃতার ব্যবস্থা হবে তখন—

—আর ওইখানে, ওই পুব দিকের কোণে হবে একটা হাসপাতাল—ইস্কুলের ডাক্তার থাকবেন ওইখানে—ওর পাশেই—

আদিনাথ কিন্তু এ-সব কিছুই দেখছিল না। এ-সব কথা আদিনাথের সব জানা। সুকুমারী তাকে অনেকবার বলেছে।

সুকুমারী বলতো—কমলাদি কেবল দিন-রাত ওই-সব কথাই ভাবে। যে আসে তাকে দেখায় কোথায় হবে কলেজ, কোথায় হবে হাসপাতাল—কোথায় ল্যাবরেটারি—

আর একটা কথা মনে পড়লো আদিনাথের।

সুকুমারী বলেছিল—কালোর-মা'র ছেলে যেদিন মারা গেল কলেরা হয়ে—সেদিন কী কাণ্ড—আমরা তো সবাই হা-হুতাশ করছি, কালোর-মা আছড়ে-পিছড়ে কাঁদছে—আর কমলাদি ?

মনীষাদি বললে—কী পাথর মন ভাই কমলাদির—

মাধুরীদি বললে—মায়ের পেটের ভাইবোন তো নেই কমলাদির—তাই অমন কঠিন মন ওঁর—

সেক্রেটারি এলেন। কমলাদিও সঙ্গে গেল। ইস্কুলের লাগোয়াই কালোর-মা'র বাসা। লোক দিয়ে মরা ছেলেকে বার করে নিয়ে এলেন। ছাড়তে কি চায়! মরা ছেলেকে আঁকড়ে পড়ে আছে কালোর-মা। বলে—বাছাকে আমার ছাড়বো না গো—

এক ধমক দিলে কমলাদি।

মেয়েমানুষের গায়ে কে আর হাত দেবে। শেষে কমলাদিই কালোর-মাকে দু'হাতে চেপে ধরলে আর ওরা ছেলেকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ঘরের বিছানা-পত্তোর টেনে নিয়ে গিয়ে বাইরে পুড়িয়ে ফেলা হলো।

কমলাদি বলেছিল—তোমাদের মত অতো নরম হলে ইস্কুল চালানো যায় না ভাই—

সুকুমারী বলেছিল—আমাদের সকলের তখন চোখ ছল্ ছল্ করছে কান্নায়। আহা, কালোর-মা'র একমাত্র ছেলে! কিন্তু কমলাদি'র চোখ শুকনো খট্‌খটে একেবারে—

পরের মাসে কালোর-মা'র মাইনে থেকে কমলাদি পাঁচ টাকা মাইনে কেটে নিলে।

কালোর-মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—আমার পাঁচ টাকা মাইনে তুমি কেটে নিলে বড়দিদিমনি?

কমলাদি বললে—ও-মাসে তোমার ক'দিন কামাই ছিল, মনে নেই কালোর-মা?

—কামাই আমি আবার কবে করলুম বড়দিদিমনি!

—শোনো কথা, তোমার ছেলে মারা যাবার সময় কাজ করেছো তুমি?

কালোর-মা ডুকরে কেঁদে উঠলো। বললে—তা বড়দিদিমনি, আমি কি সাধ করে কামাই করেছি গো—মায়ের প্রাণ হলে বুঝতে বড়দিদিমনি নাড়ীর টান কী জিনিস—

কমলাদি বললে—তোমার মোটে একটা ছেলের নাড়ীর টান আর আমাকে যে এই পাঁচশ মেয়ের ভালো-মন্দ দেখতে হয়—পাঁচশ মেয়ের ভাবনা ভাবতে হয়, ইস্কুল তো আর তোমাকে চালাতে হয় না কালোর-মা—তুমি কী বুঝবে! ছুট যদি তোমার পাওনা থাকতো তবে কোনো কথা থাকতো না—আমাকে তো ইস্কুলের আইন মেনে চলতে হবে—সেক্রেটারির কাছে সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে—তখন তো তুমি আমায় ঠেকাতে আসবে না কালোর-মা—

কমলা দত্ত তখনও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখাচ্ছে আদিনাথকে। তার অনেক স্বপ্ন, অনেক বাসনা, অনেক আকাঙ্ক্ষা। সেক্রেটারি কমলা

দত্তকে বলেছেন—তুমি সাধারণ নও কমলা, ঘরকন্নার জীবন নয় তোমার, মনে রেখো, ভগবান তোমাকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

ছোটবেলায় সেক্রেটারি একদিন পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন—অনেকেই তো অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছোতে পারতো, কিন্তু কেন পারেনি জানো? তাদের বিশ্বাস ছিল না, লক্ষ্য স্থির ছিল না। সে ছিল শুধু এক কলম্বসের—

রামমোহন সেনমশাই-এর সঙ্গে আহ্লাদীবউ-এর বিশেষ কথা হতো না। কথা বলবার সময় হতো না। বলতে সাহসও হতো না তাঁর। কর্তার মেজাজই আলাদা। লেখাপড়া বিষয়পত্র নিয়ে তিনি নিজের মনেই কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আহ্লাদীবউ নিজের কাজটা নিজে দেখলেই সব সুশৃঙ্খলে চলতো। ছেলে মেয়ে হয়েছে বছর বছর বটে, কিন্তু একটাও মানুষ করতে হয়নি নিজের হাতে। নিজে শুধু প্রসব করেই খালাস। তারপর বাড়িতে নিকট-দূর নানান সম্পর্কের লোক আছে। মাসী, পিসী, জেঠি, খুড়ি।—সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তারা। এ-বাড়ির কর্তা-গিন্নী ছেলে-মেয়ে নাতিপুতির তদ্বির-তদারক সেবা-যত্ন করতেই তাদের রাখা। কেউ কুলোটা নিয়ে ডাল বাছে, কেউ রান্না-ঘরের ভারটা নিয়েছে। আবার কেউ ভার নিয়েছে আঁতুড়-ঘরের। এমনি নানান কাজ। গিন্নীর ছেলে হয়, মেয়ের ছেলে হয়, নাতনীর ছেলে হয়। একজন না একজনের লেগেই আছে। আঁতুড়-ঘর এ-বাড়িতে খালি পড়ে থাকে না কখনও। সুতরাং কাজও তাদের অফুরন্ত। এক-একটা সন্তান প্রসব করেছে আহ্লাদীবউ আর জীবন-সংশয় ঘটেছে তাঁর। ডাক্তার-বদ্যি ওষুধপত্তর। এলাহি কাণ্ড বেধেছে অন্দর-মহলে। কিন্তু সংসারের গতিচক্রে কোথাও গ্রন্থি পড়েনি তা বলে। বাইরে সদর বাড়ি থেকে টেরও পায়নি আমলা-কাছারির লোক। ছেলেরা ঠিক সময়ে ভাত পেয়েছে। জামাইরা ঘড়ির কাঁটা ধরে চা পেয়েছে। কর্তার খাবার নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হয়নি কোনও দিন সে-জন্যে। সাতটা বাটি সাজিয়ে চর্ব-চোষ্য সমস্তই পাতের সামনে যোগানো হয়েছে। তিনি

এ-সবের ঊর্দ্ধে বরাবর নিজের উচ্চ সৌধে স্বর্গবাস করেছেন।

কমলা দত্ত জ্ঞান হবার পর থেকেই এই সংসারে মানুষ হয়েছে। এই আবহাওয়ায় কাটিয়েছে অনেকদিন পর্যন্ত। একে-একে সমবয়সীদের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে, তাদের বর এসেছে, আবার আঁতুড়-ঘরে গিয়ে তারা যথাসময়ে সন্তানও প্রসব করেছে।

কিন্তু কেন জানি না কী কারণে বাড়ির অন্যান্য গলগ্রহ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে এক পঙক্তিতে কখনও পড়েনি কমলা দত্ত। কমলা দত্তর একটু বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গেই আহ্লাদীবউ ডেকে শাড়ি দিয়েছেন, গয়না দিয়েছেন। বাড়ির অন্য ছেলে-মেয়েরা প্রীতি দিয়েছে শ্রদ্ধা দিয়েছে।

আহ্লাদীবউ হয়তো বলছেন—হ্যাঁ গো, কমলার বয়েস হলো, এবার ওর বিয়ে-থা'র ব্যবস্থা করো—

কর্তা বলেছেন—কমলা এ-বাড়ির মেয়ে নয়, ওর জন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না—

কর্তা নিজের পাশে বসিয়ে কমলা দত্তকে দিনের পর দিন লেখা-পড়া শিখিয়েছেন।

বলেছেন—তুমি এ-বাড়ির কেউ নও, সুতরাং এ-বাড়ির কোনও জিনিসটাই গ্রহণ করো না তুমি, তোমার জন্যে সব পথ খোলা রইল—তোমার ইচ্ছে মতোই তোমার জীবন গড়ে উঠুক—এই আমার ইচ্ছে।

— কমলা তখন প্রাইমারী পরীক্ষায় পাশ করেছে।

বললে—আমি আরো লেখা-পড়া করবো—

সেক্রেটারি বললে—বেশ, পড়ো, পড়াশুনো নিয়েই থাকো, ও-ইস্কুল তা হলে আমি মাইনর ইস্কুল করে দেবো—

এমনি করে কমলাও বড় হয়েছে, ইস্কুলও বড় হয়েছে। কমলা দত্তর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সেদিনের ছোট ইস্কুল আজ বাড়তে বাড়তে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এবার কমলা দত্ত কোথায় যাবে? সুতরাং ইস্কুল আরো বাড়াও। কলেজ করো।

আদিনাথ বললে—তারপর?

কমলা দত্ত বললে—তারপর উনি বলেছেন এটা য়ুনিভার্সিটি করে

দেবেন—

আদিনাথ বললে—তারপর ?

কমলা দত্ত আদিনাথের মুখের দিকে চাইলে।

বললে—তারপর আমি তো আরম্ভ করে দিয়ে গেলাম—অন্য কেউ এসে হয়তো একদিন এর ভার নেবে—আমি আর কতদিন ! আমার কাজ ভালোভাবে চলবে এইটে ভেবেই আমি শান্তি পাবো। তা ছাড়া, জানেন তো ব্যাণ্ডেল অনেক পুরনো জায়গা। এককালে আরো খুব ভালো জায়গা ছিল, যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় রাজত্ব করেছে। ওখান থেকে সাহেবরা ছুটি কাটাতে, স্বাস্থ্য বদলাতে এখানে আসতো —এখানে ছিল পর্তুগীজদের আড্ডা। এখনও কত দেখবার জিনিস আছে এখানে—আপনি দেখেছেন ?

আদিনাথ বললে—না, কিছুই দেখা হয়নি আমার—

কমলা দত্ত বললে—সে কি, এতদিন আসছেন শনিবার-শনিবার, গাড়ি-ভাড়া করে কলকাতায় যাচ্ছেন-আসছেন, আর ব্যাণ্ডেলটাই দেখেননি ?

আদিনাথ বললে—দেখবার সময় পেলুম কই, চিনি এখানকার মধ্যে শুধু ব্যাণ্ডেল স্টেশনটা আর আপনাদের এই ইস্কুলটা—এর বাইরে আমার কাছে সব ফাঁকা—

কমলা দত্ত বললে—সুকুমারীকে নিয়ে একদিন দেখলেই পারেন—

আদিনাথ বললে তবেই হয়েছে, সুকুমারীও আমার মতন নতুন লোক এখানে, দেখাতে পারেন এক আপনি। সত্যি, আমার দেখবার বড় ইচ্ছে। দেখাবেন ?

কমলা দত্ত চুপ করে রইল।

আদিনাথ বললে—ও, বুঝেছি, সেক্রেটারি হয়তো কিছু মনে কর-বেন, না ?

তারপর একটু থেমে বললে—তা হলে আজকেই চলুন না, আজ তো সেক্রেটারি এখানে নেই—

কমলা দত্ত বললে—তার চেয়ে আপনি আসছে শনিবারে বরং

আসুন—

—আসছে শনিবারে সেক্রেটারি থাকবেন না বুঝি ?

—না, সেদিনও ওঁকে কলকাতায় যেতে হবে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ—

—তবে তাই আসবো।

আদিনাথ আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। কমলা দত্তও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

আদিনাথ হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—কিন্তু আপনি আমার সেই কথাটার তো জবাব দিলেন না ?

—কোন্ কথা ?

আদিনাথ বললে—ওই যে আপনি বললেন, সুকুমারীকে লুকিয়ে এখানে এসেছি তা আপনি কী করে জানলেন ?

কমলা দত্ত এবার হেসে উঠলো।

বললে—সুকুমারী আমাকে চিঠি লিখেছে যে—

—আপনাকে চিঠি লিখেছে ?

—হ্যাঁ, তাতে আপনার কথাও লিখেছে কি না। লিখেছে আপনি নাকি বড় ব্যস্ত, তার সঙ্গে দেখা করবার সময়ও পান না।

তারপর একটু থেমে কমলা দত্ত বললে—ব্যস্ত যে কত তা তো দেখতেই পাচ্ছি, দুটো শনিবার পর পর আমার সঙ্গে দেখা করবার সময় তো আপনার হলো—

আদিনাথ বললে—কিন্তু আপনি যেন আবার সে-কথা সুকুমারীকে চিঠিতে জানাবেন না—

—কিন্তু আমি তো চিঠির উত্তর দিয়েই দিয়েছি।

—সর্বনাশ করেছেন !

কমলা দত্ত বললে—কেন, এ-কথা লিখলে কি সে খুব রাগ করবে ?

—রাগ করবে না ?

কমলা দত্ত বললে—কেন, রাগ করবার কী আছে ? আপনি কি কিছু

অন্যায় করেছেন ?

আদিনাথ বললে—অন্যায় করি আর না-করি, সুকুমারী মেয়েমানুষ তো, সে ভুল বুঝবে—কান্নাকাটি করবে—দেখুন তো আমার কী সর্বনাশ করলেন আপনি—

কমলা দত্ত বললে—তা দোষ করলে শাস্তি আপনাকে ভুগতেই হবে বৈকি। কিন্তু আপনি বোধহয় আজ ট্রেন ফেল করবেন—

আদিনাথ গাড়ির পা-দানিতে পা দিতে যাচ্ছিলো।

কিন্তু আবার ফিরলো। বললে—আসছে শনিবার তা হলে আসছি তো ?

কমলা দত্ত বললে—সেই করম কথাই তো রইল !

আদিনাথ বললে—কিন্তু সুকুমারীকে না বলেই আসবো তো ?

কমলা দত্ত বললে—কেন, আপনি তো কিছু অন্যায় করছেন না, বলেই আসবেন।

আদিনাথ বললে—যদি না বলি, আপত্তি আছে ?

কমলা দত্ত এবার সত্যিই গম্ভীর হয়ে গেল।

বললে—হ্যাঁ, আপত্তি আছে—বলে না এলে আপনারও এখানে আসবার দরকার নেই। বরং সুকুমারীকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসবেন, আরো ভালো হবে…

বলে কমলা দত্ত দরজা বন্ধ করে দিলে।

পরের শনিবার কমলা দত্ত তৈরিই ছিল। কাজ-টাজ সব গুছিয়ে প্রস্তুত। বাইরে গাড়ির শব্দ হয়েছে তাও কানে গেল। তারপর প্রতি মুহূর্তে আদিনাথের আসার প্রতীক্ষা করছে।

কমলা দত্ত চোখ নিচু করেই ছিল। পায়ের আওয়াজ হতেই মুখ তুলে দেখলে সামনেই আদিনাথ। হাসি-হাসি মুখ। দু'হাত জোড় করে রয়েছে।

কমলা দত্ত বললে—কই, আপনি একলা ? সুকুমারী কই ?

আদিনাথ বললে—সুকুমারী আসেনি—

কমলা দত্ত বললে—আপনি সুকুমারীকে বলে এসেছেন তো ?

আদিনাথ চুপ করে রইল। একবার ভয়ও হলো। যদি সত্যিই রেগে যায়। এ-মেয়েকে বিশ্বাস নেই।

কমলা দত্ত বললে—নাঃ, আপনাকে নিয়ে দেখছি সুকুমারীর অনেক জ্বালা—

যেন ভরসা পেলে এবার আদিনাথ। চেয়ারে বসলো এতক্ষণে।

বললে—যার জ্বালা তার জ্বালা, আপনার তো আর সে-ভয় নেই—

কমলা দত্ত না হেসে তেমনিভাবেই বললে—ভয় নেই কিন্তু ভরসাও যে পাচ্ছি না—আপনারা মেয়েদের নিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেলবেন, তাতে সমাজেরই কি কল্যাণ হবে! মেয়েদের এইভাবে ছোট করে রাখলে কি ভাবছেন দেশেরই কোনও উপকার হবে। নইলে সাধ করে কি এই মেয়েদের ইস্কুল নিয়ে পড়ে আছি! সংসারে মেয়েদের উন্নতি না হলে কোনও আশা নেই জানবেন, তাই পরমহংসদেব স্ত্রী-গুরু গ্রহণ সমর্থন করেছিলেন, নারীভাবে সাধন-ভজন করেছিলেন, মাতৃভাব প্রচার করেছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দও মেয়েদের জন্যে মঠ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আদিনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। চুপ করে কমলা দত্তর সব কথা কান পেতে শুনলে।

তারপর বললে—আমার আশা ছিল আপনি হয়তো আমায় ক্ষমা করবেন!

কমলা দত্ত বললে—এমন আশা আপনি কেমন করে করতে পারলেন? ভেবেছিলেন আমিও অন্য পাঁচজনের মতো মেয়েমানুষ বুঝি—

আদিনাথ বললে—তা জানি, কিন্তু তবু সুকুমারীকে লেখা আপনার চিঠিটা পড়েই আমার এমন ধারণা হয়েছিল—

কমলা দত্ত একটু যেন নরম হয়ে এল।

হেসে বললে—সে চিঠি সুকুমারী আপনাকে পড়িয়েছে বুঝি?

আদিনাথ বললে—হ্যাঁ, সুকুমারী আমার কাছে কিছু গোপন করে

না—তা সে যাক, কিন্তু আমার এখানে আসার কথা তাকে যে কিছু জানাননি তার জন্যে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ—

কমলা দত্ত আরও হাসলো। বললে—কিন্তু এবার তাকে জানাবোই, বার বার আর ক্ষমা করা যায় না আপনাকে—

আদিনাথ বললে—দোহাই আপনার, আর কিছু দিন সময় দিন, অন্তত তিনটে মাস—

কমলা দত্ত বললে—তিন মাস ?

আদিনাথ বললে—তিন মাসের মধ্যে যা-হোক কিছু হেস্তনেস্ত করতেই হবে আমাকে—

কমলা দত্ত বললে—কিসের হেস্তনেস্ত ?

আদিনাথ বললে—দেখি—সেকথা এখন বলতে পারবো না—কিন্তু আসছে শনিবার দিন আমি কথা দিচ্ছি সুকুমারীকে নিয়েই এখানে আসবো—অন্তত একটা সপ্তাহ আমাকে সময় দিন—

কমলা দত্ত বললে—কিন্তু আসছে শনিবার সেক্রেটারি তো এখানে থাকবেন—সেদিন তো আসা হবে না—

—তা হলে অন্য যে কোনোদিন ?

—অতো তাড়া কীসের, আর দু'দিন বাদে তো ইস্কুলই খুলে যাচ্ছে —তখন তো সুকুমারীর জন্যে আসতেই হবে আপনাকে—

আদিনাথ বললে—কিন্তু আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, এখানকার দু-একটা জায়গা দেখাবেন আজ—

কমলা দত্ত যেন কিছুক্ষণ কী ভাবলে। একবার একটু দ্বিধা করলে। তারপর বললে—অকারণ কথা বলতে বলতে কিছু দেরিই হয়ে গেল, তা কথা যখন আপনাকে দিয়েছি, চলুন—আর দেরি করে লাভ নেই—

সেদিনই কমলা দত্ত প্রথম আদিনাথের সঙ্গে বেরোলো।

কমলা দত্ত বললে—কাপড় আর বদলাবো না, এ তো আমার নিজের দেশ, চলুন এমনিভাবেই বেরিয়ে যাই—কিন্তু বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবো না—

আদিনাথের ভাড়া-করা গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল। কমলা দত্ত ভেতর

থেকে মুখটা একটু মেজে-ঘষে এল। খোঁপাটাও একটু গুছিয়ে নিলে।

বললে—চলুন, যখন ছাড়বেন না, তখন যাই।

কালোর-মা এসে পেছনের দরজা বন্ধ করে দিলে।

কমলা দত্ত গাড়ির দরজা খুলে একটা পা তুললো। আর একটা পা তখনও মাটিতে। ডান পায়ের টান পড়ে কাপড়টা একটু সরে গিয়েছে। হঠাৎ বাঁ পায়ের গোড়ালিটা স্পষ্ট দেখতে পেলে আদিনাথ। সুগোল, সুডৌল গোড়ালি। অল্প-অল্প আলতার রেখা তখনও লেগে রয়েছে।

আদিনাথ বললে—দেখেই আমার মনে পড়লো সেই শ্লোকটা—

দীর্ঘা সুদীর্ঘনয়না বরসুন্দরী যা
কামোপভোগরসিকা গুণশীলযুক্তা।
রেখাত্রয়েণ বিভূষিতা কণ্ঠদেশা
সম্ভোগকেলিরসিকা কিল শঙ্খিনী সা॥

রতিমঞ্জরীতে শঙ্খিনী নারীর এই বর্ণনার সঙ্গে যেন হুবহু মিলে গেল ভাই। মনে হলো এই মেয়ে স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, বোন হিসেবে কী চমৎকারই না মানায়। যে কোনও পুরুষের ঘর আলো করে থাকবে। সংসার করলে কী সুগৃহিণীই না হবে। কিন্তু মনে হলো তা যেন হবার নয়, কোথাও যেন গোলমাল বেধেছে।

গাড়িতে উঠে যথারীতি জানলা-দরজা বন্ধ করে দিয়েছে কমলা দত্ত।

বললে—বলুন, কোথায় আগে যাবেন?

আদিনাথ বললে—যেখানে আপনি নিয়ে যাবেন! আপনার হাতেই নিজেকে বিসর্জন দিলাম আজ—

—চলুন আগে জুবিলী ব্রিজের দিকে যাই—তারপর সেই পর্তুগীজদের গীর্জাটা দেখাবো আপনাকে—

আদিনাথ বললে—মনে করে দেখ, এক গাড়ির মধ্যে দুজন তখন বসে আছি। আমাকে তো তুমি চেনো। নানান ধরনের মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা আমার অভ্যেস আছে। রতিমঞ্জরীর মতে পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী সব রকম ধরনের মেয়েদের সঙ্গে লক্ষণ মিলিয়ে

মিলিয়ে কথা বলে মিশে দেখেছি। একসঙ্গে, একঘরে, এক ট্যাক্সিতে দিন-রাত দুপুর-সন্ধ্যে কাটিয়েছি। শঙ্খিনী মেয়ে যে আগে দেখিনি তা নয়। কিন্তু সে যেন আসল খাঁটি শঙ্খিনী নয়। কিছুটা পদ্মিনী বা কিছুটা শঙ্খিনী, চিত্রিনীর ছিটে-ফোঁটা মেশানো—অর্থাৎ ভেজাল। কিন্তু এই কমলা দত্তকেই দেখলুম প্রথম একেবারে খাঁটি শঙ্খিনী।

কতদিন কত বছর আগের কথা বলছি। আজ কমলা দত্তর সে-সব কথা মনেই নেই। কিন্তু আমার প্রতিটি খুঁটিনাটি এখনও মনে আছে।

চুপচাপ মুখোমুখি বসে যাওয়া। অস্বস্তি বোধ করবার কথা কমলা দত্তর। কিন্তু হলো উল্টো। আমারই যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো।

কিছু যেন কথা বলতে হবে এই জন্যেই শুধু বললাম—আপনাদের সেক্রেটারি এখানে থাকলে হয়তো আমার সঙ্গে আপনি এমন করে বেরোতে পারতেন না—না?

কমলা দত্ত তেমনিভাবেই বসে বললে—তিনি তো আমার ভালোর জন্যেই বলেন—। যেমন আমি সুকুমারীকে আপনার সঙ্গে মেলা-মেশা করতে বারণ করি—সে তো সুকুমারীর ভালোর জন্যেই—

আদিনাথ বললে—সুকুমারীর কথা থাক, আপনার কথাই বলুন শুধু আজ—শুনি—

কমলা দত্ত গাড়িতে উঠে যেন ঝিমিয়ে এসেছে।

বললে—আমার কথা? আমার কথা কী শুনতে চান বলুন—বাঘ-নিম্নুন্দিপুরে জন্ম, ছোটবেলায় বাবা একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, তারপর পাঁচ বছর বয়েস থেকে সেনমশাই-এর কাছেই মানুষ, বরাবর ওঁর আওতার মধ্যেই বড় হয়েছি। উনি সারাজীবন যেমনভাবে চালাচ্ছেন, তেমনিভাবে চলাটাই ঠিকভাবে চলা বলে ভাবতে শিখেছি—মন যা করতে চায় সেইটেকেই পাপ বলে জেনে এসেছি। আর মন যা চায় না সেইটেই ঠিক পথ বলে চিনে এসেছি—কেবল কাজ আর লেখা-পড়ায় মনকে ডুবিয়ে রেখেছি—অন্য কোনও দিকে মন দেবার অবসরই পাইনি—মোটামুটি এই-ই হলো আমার কথা, আর কী শুনতে চান বলুন—

আদিনাথ বললে—কিন্তু সংসারে এই পথটাই বা বেছে নিলেন

কেন ? এই ইস্কুল-মাস্টারীর পথ ?

কমলা দত্ত বললে—কেন, অনেকেই তো ইস্কুল-মাস্টারী করে—সুকুমারীও তো করছে—

আদিনাথ বললে—সুকুমারী তো টাকার জন্যে করছে, পরের গলগ্রহ ও, ভালো বিয়ে হলেই তো ছেড়ে দেবে—কিন্তু আপনার তো তা নয়—

কমলা দত্ত বললে—আমারও তো একরকম তাই—

—আপনার কি সত্যিই তাই ? আপনার জন্যে সেক্রেটারি তো হাজার-হাজার টাকা খরচ করেছেন—

—আমার জন্যে কেন বলছেন, ইস্কুলের জন্যে খরচ করেছেন বলুন—

আদিনাথ বললে—কিন্তু আপনি তো ভালো রকমই জানেন—ইস্কুলটা হলো উপলক্ষ্য—কেবল আপনাকে রাখার জন্যেই ছোট ইস্কুল থেকে বড় ইস্কুল হলো—এবং আপনাকে আরো বেশিদিন কাছে রাখার জন্যেই ইস্কুল আরো বড় করছেন—কলেজ করছেন—

কমলা দত্ত বললে—ওঁর মতন লোকের সাহচর্য আরো যতদিন পাই ততই তো আমার ভালো—তাতে আমারই তো লাভ—

আদিনাথ বললে—কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলবো ?

—বলুন—

—লাভ আপনার কিছুই নেই—বরং লোকসানই ষোলাআনা—

কমলা দত্ত হাসলে। বললে—আর লাভ বুঝি যা কিছু রামমোহন সেনমশাই-এর ? আমার জন্যে হাজার-হাজার টাকা খরচ করে, আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করে, নিজের খরচে লেখাপড়া শিখিয়ে লাভটা ওঁরই, আমার নয়—এই তো আপনার যুক্তি ?

আদিনাথ বললে—ঠিক ধরেছেন।

—কিন্তু আমি ওঁর মেয়ে না ওঁর আত্মীয়—কে ?

আদিনাথ বললে—আপনি ওঁর নিজের মেয়ে নয় বলেই তো লাভ, আপনি ওঁর আত্মীয় নয় বলেই তো লাভ, নিজের মেয়ে হলেও এত করতেন না, আত্মীয় হলেও এত করতেন না—

কমলা দত্ত বললে—তার মানে ?

আদিনাথ বললে—সেনমশাই-এর নিজের মেয়েও তো ছিল, আত্মীয়-স্বজনেরও তো অভাব-নেই—তাদের কজনকে এত লেখাপড়া শিখিয়েছেন ? তাদের কজনের পেছনে এত টাকা খরচ করেছেন ? তাদের তো ঠিক সময়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন—তারা সবাই স্বামী, ছেলে, মেয়ে নিয়ে তো সুখে ঘর-সংসার করছে—

কমলা দত্ত যেন আজ এক নতুন কথা শুনলে। আদিনাথের দিকে স্পষ্ট করে সোজাসুজি চেয়ে দেখলে। যেন এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছে সে।

খানিক পরে বললে—সত্যি, কেন বলুন তো ? আপনার কী মনে হয় ? আমার বেলাতেই এই ইস্কুল, কি কলেজ, এই আশ্রম, ত্যাগ—আমি ওঁর মেয়েদের থেকে সত্যিই আলাদা ? নইলে আমার জন্যে তিনি কেন এত করেন ?

—কেন, বলবো ? ···না থাক—

বলে আদিনাথ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আপনার সঙ্গে আমার কদিনেরই বা সম্পর্ক—এইটুকু অল্প পরিচয়ে সে-কথা বলা যায় না—অথচ দেখুন, তাই বলতেই আপনার কাছে আজ আমার আসা—নইলে আপনি যে সন্দেহই করে থাকুন, বিশ্বাস করুন আপনার কাছে আমার আসার আর কোনও কারণই নেই—

কমলা দত্ত বললে—না, সত্যি আপনি বুঝিয়ে বলুন—কেন ? কেন এমন করেন উনি ?

আদিনাথ বললে—বনের পাখীকে মানুষ সোনার খাঁচায় পুরে রেখে যে কারণে দুধ-ছোলা খেতে দেয় এ-ও সেই কারণেই করেন—

কমলা দত্ত বললে—কিন্তু আমার ইস্কুল—ইস্কুলকে যে আমি ভালো-বাসি—আপনি জানেন না আমার কত যত্নের জিনিস এই ইস্কুল—কত সাধনার জিনিস—ইস্কুলকে বাদ দিয়ে যে কিছু ভাবতে পারি না আমি—

আদিনাথ বললে—ঠিকই বলেছেন, খাঁচার পাখীও তো মনে ভাবে সোনার খাঁচাটা তার···

কমলা দত্ত অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবতে লাগলো।

গাড়ি চলছে ধিকি-ধিকি করে। গাড়ির দোলানির সঙ্গে কমলা দত্তর আঁটোসাঁটো শরীরটা দুলছে। কিন্তু কোনও দিকেই যেন আর লক্ষ্য নেই এখন কমলা দত্তর।

হঠাৎ ওপর থেকে গাড়োয়ান হাঁকলে—বাবুজী, জুবিলী ব্রীজ এসে গিয়েছে—

আদিনাথ বললে—নামুন এবার—

বাইরে পরিপূর্ণ বিকেল। চওড়া গঙ্গা। তার ওপর বিরাট লম্বা ব্রীজ। হু হু করে হাওয়া আসছে। কমলা দত্তর আঁটোসাঁটো কাপড়ও বিপর্যস্ত করে দেয়। অনেকে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসেছে। কলকাতা থেকে যুদ্ধের সময় অনেক লোক এসেছে এখানে। কমলা দত্ত গাড়ি থেকে নেমেও যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে রইল।

আদিনাথ বললে—চলুন, ওই ঘাসের ওপর গিয়ে বসি—

কমলা দত্ত নিঃশব্দে গিয়ে বসলো।

পাশে বসে আদিনাথ বললে—শুনেছিলাম এ-ব্রীজ লম্বায় বারোশ' ফুট—রেল কোম্পানী নাকি ন'লাখ টাকা এর পেছনে খরচ করেছে—কিন্তু তত বড় তো মনে হচ্ছে না—

কমলা দত্ত এবারও কোনো কথা বললে না।

আদিনাথ খানিক চুপ করে থেকে বললে—এতদিন এখানে এসেছি, অথচ আশ্চর্য, এই গঙ্গার ধারেই এমন বেড়াবার জায়গা আছে, এ আমরা কেউ জানতাম না—জানেন—

কমলা দত্ত এবারও কোনো উত্তর করলে না। খানিক পরে বললে—চলুন, অন্য জায়গায় যাই—এখানে ভালো লাগছে না আমার—

আদিনাথ অবাক হলো—কেন?

—এখানে বড় ভিড়, ইস্কুলের অনেক মেয়ের গার্জেন এখানে আসেন, হয়তো কারো নজরে পড়ে যাবো—

—কিন্তু দেখতে পেলেই বা, তাতে কী হয়েছে? আমি আছি বলে?

কমলা দত্ত বললে—না, সে আপনি বুঝবেন না, চলুন, আর এক জায়গায় যাই—

আবার গাড়িতে ওঠা। এবার অন্য দিকে চললো। খানিকদূর এসে কমলা দত্ত বললে—এখানেই গাড়ি থামাতে বলুন—

গাড়ি থামলো। আগে নামলো আদিনাথ, তারপর কমলা দত্ত।

আদিনাথ বললে—এই বুঝি সেই পর্তুগীজদের গীর্জা—এর নাম শুনেছি—বাঙলাদেশের সব চেয়ে পুরনো গীর্জা নাকি এটা—

অনেক প্রাচীন গীর্জাই বটে। শ্যাওলা-ধরা দেয়াল। বড়-বড় গাছ। গাছের তলা দিয়ে রাস্তা। আলো-ছায়ার লুকোচুরি দিয়ে ঘেরা বিরাট কম্পাউণ্ড। মোগলরা হুগলী আক্রমণ করে এর আগেকার বাড়ি-ঘর-দোর সব ভেঙে দিয়েছিল। সে ১৬৩০ সালের কথা। তারপর দিল্লীর বাদশার কী দয়া হলো কে জানে! তিনিই আবার ফাদার ডি-ক্রুজ্‌কে ৭৭১ বিঘে নিষ্কর জমি লিখে দিলেন। তারপর ১৬৬১ সালে ফাদার ডি-সোটো তৈরি করলেন এই চার্চ। এখানে লোকজন কেউ নেই, ভারি নির্জন জায়গাটা।

গীর্জায় ঢোকবার মুখে জাহাজের একটা বিরাট মাস্তুল দাঁড়িয়ে আছে।

কমলা দত্ত বললে—এই মাস্তুলটা নিয়ে একটা গল্প আছে জানেন—

আদিনাথ বললে—কী গল্প?

কমলা দত্ত বললে—চলুন, এবার কোথাও গিয়ে বসি—বসে আপনাকে গল্পটা বলবো—

আদিনাথ বললে—কোথায় বসবেন?

কমলা দত্ত বললে—যেখানে হোক, পা ব্যথা করছে—চলুন, ওই দিকটায় যাই—

ও-দিকটায় কয়েকটা বড় গাছ ঘেঁষাঘেঁষি করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার নিচে দু'দিক থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। সিঁড়ির দু'-পাশে উঁচু দেয়াল। দেয়ালের গায়ে মোটা সরের মতো শ্যাওলা জমেছে। আর একেবারে সিঁড়ির মাথায় একটু চাতাল মতন। চাতালের পাশেই একটু বসবার জায়গা। ওখানে বসলে সামনে আর পেছনে দেয়াল। কোথাও কোনওদিকে দেখা যায় না। শুধু মাথার ওপর সব কিছুর বোবা

সাক্ষী আকাশ। বিকেলের শান্ত এক টুকরো আকাশ শুধু, আর কিছু নেই।

আদিনাথ বললে—জায়গাটা বড় চমৎকার তো—এ বুঝি আপনি চিনতেন আগে থেকে?

কমলা দত্ত বললে—আমি চিনবো কী করে! আমি কি আগে কখনও এসেছি?

—কখনও আসেননি? অথচ এতদিন আছেন!

কমলা দত্ত বললে—ইস্কুল নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতে হয়—সময় কখন পাই বলুন?

আদিনাথ বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে—কিছু মনে করবেন না তো?

কমলা দত্ত বললে—বলুন, কী?

আদিনাথ বললে—সমস্ত দিনই তো আপনাকে ইস্কুল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় বললেন—কিন্তু কখনও নির্জনে থাকতে ইচ্ছে করে না আপনার?

কমলা দত্ত অবাক হয়ে গেল। বললে—কই, নির্জনতা আমার মোটে ভালো লাগে না, বেশ সবাই হৈ চৈ করবে—সেই তো ভালো!

আদিনাথ বললে—তবু, নিজের মনকে নিয়ে কখনও একলা খেলা করতে ইচ্ছে করে না? খুব যখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ে, বুকটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে না? কিম্বা মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গিয়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করেন না?

কমলা দত্ত বললে—তা করবো কেন? আমার কি মাথা খারাপ?

—তা হলে ছুটির দিনে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়লে কী করেন?

—ঘরের বাইরে গিয়ে দেখি—শুকনো কাপড়গুলো ঘরের ভেতরে তুলে আনি।

—আর মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে?

—ঘুম ভেঙে গেলে মুখে-চোখে জল দিয়ে এসে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করি।

—যদি ঘুম না আসে ?

—ঘুম না এলেও আলো নিবিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকি।

—তখন সেই সব রাতে কিছু মনে পড়ে না ? কারুর মুখ ? পুরনো কিছু টুকরো টুকরো স্মৃতি—কিম্বা ছোটবেলার ঘটনা, বাপ-মা'র কথা কিম্বা প্রথম যৌবনের স্বপ্ন ?

—মনে হয়তো পড়ে, কিন্তু সব কি মনে করে রেখেছি ?

আদিনাথ বললে—হয়তো মনে রাখবার মতো কিছুই ঘটেনি, ঘটলে নিশ্চয়ই মনে থাকতো ! কিন্তু মনে করবার মতো ঘটনা জীবনে কি আপনার কিছুই ঘটেনি ? বেশ করে ভেবে দেখুন তো—

কমলা দত্ত খানিক ভেবে নিয়ে বললে—না, সত্যি কিছুই ঘটেনি।

আদিনাথ বললে—আশ্চর্য তো—

কমলা দত্ত বললে—আশ্চর্য হলেন কেন ? সকলের জীবনেই কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ?

আদিনাথ বললে—সকলের জীবনে ঘটে—আপনি ছাড়া আর সকলের জীবনেই ঘটেছে—

কমলা দত্ত বললে—আপনার জীবনে কী ঘটনা ঘটেছে শুনি—যা চিরকাল আপনার মনে আছে, চিরকাল আপনার মনে থাকবে ?

আদিনাথ আরো কাছে সরে এল। বললে—আমার জীবনে ? তা হলে বলি—আজ এই যে ব্যাণ্ডেলের গীর্জার সিঁড়িতে বসে বিকেলবেলা আপনার সঙ্গে গল্প করছি—এ ঘটনা জীবনে আমি কখনও ভুলবো না—এ আমার মনের মণিকোঠায় গাঁথা রইল কমলা দেবী।

কমলা দত্তর সমস্ত শরীরটা যেন শির্-শির্ করে উঠলো। মাথাটা নিচু করে ফেললে হঠাৎ।

আদিনাথ স্বগতোক্তির মতোই বলে যেতে লাগলো—আমাদের আর ক'দিনেরই বা পরিচয় বলুন—বলতে গেলে আজকে নিয়ে মাত্র দুটো শনিবারের সামান্য আলাপ, অথচ মনে হয় যেন কতকালের চেনা আপনি—কিন্তু কী জানি এত কথা বলা হয়তো আমার উচিত হচ্ছে না—তবু আজকের পর আমাদের দেখা হলেও এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলবার

সুযোগ হয়তো আর কখনও হবে না—কিন্তু যেদিন বুড়ো হয়ে যাবো, চোখে ছানি পড়বে, তখন এইটুকু মনে করেই কেবল শান্তি পাবো যে, কমলা দত্ত নামে একটি মেয়ের সঙ্গে একদিন ব্যাণ্ডেল-গীর্জার সিঁড়ির চাতালে বসে বিকেলের আলোয় দু'দণ্ড যেমন শান্তি পেয়েছিলাম এমন আর কোনোদিন কোথাও পাইনি কারো কাছে—

কমলা এবারেও চুপ করে রইল।

আদিনাথ বলতে লাগলো—আপনার এ ইস্কুল একদিন বড় হবে। আপনার যশ একদিন আরো ছড়াবে, সেদিন হয়তো আমি এখান থেকে অনেক দূরে বাঙলাদেশের বাইরে অন্য কোথাও অখ্যাত, অবজ্ঞাত অবস্থায় দিন কাটাবো। কেউ আমাকে চিনবে না, জানবে না। তবু এই-টুকু সান্ত্বনা নিয়ে বাঁচবো যে, আমি কমলা দত্তকে চিনি, কমলা দত্তর সঙ্গে একত্র নির্জনে বসে একদিন গল্প করেছি—একদিন কমলা দত্ত তাঁর কাজের ক্ষতি করে আমার সঙ্গে গল্প করেছেন, যতটুকু বা যত ক্ষণকালেরই হোক, সেই স্মৃতিই আমার অক্ষয় হয়ে থাকবে—

কমলা দত্ত তবু মুখ তুললে না। নখ দিয়ে দেয়ালের শ্যাওলা খুঁটতে লাগলো।

শুধু বললে—আপনি কি এই সব কথা বলতেই এখানে এসেছিলেন আজ?

আদিনাথ বললে—কী কথা বলতে এসেছিলাম, তা তখন আমার নিজেরও জানা ছিল না—আর থাকলেও এখন আর আমার তা মনে নেই।

কমলা দত্ত তেমনি শ্যাওলা খুঁটতে খুঁটতেই বললে—আমার সঙ্গে মিশে কেউ যে এত আনন্দ পায় তা আমি ধারণাই করতে পারিনি সত্যি—

আদিনাথ বললে—আর কেউ পায় কি না জানি না, কিন্তু আমি পেয়েছি—আমার সাধ মিটে গিয়েছে, আমি আর কিছু চাই না—

কমলা দত্ত বললে—এক একবার তাই ভাবি, ঘর-সংসার তো সবাই করে, আমি হয়তো চেষ্টা করলেও পারবো না—ছোটবেলায় মেয়েরা পুতুল

খেলে, পুতুলের বিয়ে দেয়, ঘরকন্নার খেলা করে, আমাকে সেনমশাই যে তাও কখনও করতে দেননি—বলেছেন—আমার জন্যে ও-সব কিছু নয়—আমি অন্য মেয়ের থেকে আলাদা—

আদিনাথ বললে—মোটেই আলাদা নন—দোহাই আপনার, আপনি বোন হোন, স্ত্রী হোন, মা হোন—কে বলে আপনাকে মানাবে না—?

কমলা দত্ত চুপ করে তখনও নখ দিয়ে শ্যাওলা খুঁটছে।

এক সময়ে শুধু বললে—আমার যে ভয় করে—

—কিছু ভয় নেই। বোন হতে চেষ্টা করুন দেখি ঠিক ভাই পাবেন, স্ত্রী হতে চেষ্টা করুন ঠিক স্বামী পাবেন, মা হতে চেষ্টা করুন, সন্তান পাবেন। আসল কথা আপনি সত্যিকারের মেয়েমানুষ হোন—

কমলা দত্ত যেন একটু মৃদু হাসলো এবার।

বললে—আমি মেয়েমানুষ নই তো কী শুনি?

আদিনাথ বললে—আপনি খাঁচার পাখী—আবার বনের পাখী হোন না, হতে চেষ্টা করুন না—আপনাকে চমৎকার মানাবে—দেখবেন—

কথাটা বলে শ্যাওলা-ধরা দেয়ালটার দিকে হঠাৎ তার নজর পড়তেই আদিনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ ধরে কমলা দত্ত নখ দিয়ে শ্যাওলা খুঁটতে খুঁটতে কখন যে নিজেরই অজ্ঞাতে স্পষ্ট করে তার নামটা লিখে ফেলেছে—সে-খেয়ালই তার ছিল না। কমলা দত্ত স্পষ্ট লিখে ফেলেছে—আ-দি-না-থ!

আদিনাথ হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। খপ্ করে কমলা দত্তর হাতটা ধরে ফেলেছে।

বললে—দেয়ালে আপনি যা লিখেছেন, তা মুছতে পারবেন না—কিছুতেই মুছতে পারবেন না—

কমলা দত্তও হঠাৎ লেখাটা দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। ছি ছি, কখন আদিনাথের নামটা লিখেছে সে, কথা বলতে বলতে তার নিজেরই তখন খেয়াল ছিল না। আদিনাথের হাত থেকে নিজের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে লেখাটা মুছে দিতে গেল।

বললে—না না, ছি ছি, কী ভাবলেন আপনি—ছিঃ—

কিন্তু আদিনাথও ছাড়বে না। কমলা দত্তর হাত দুটো জোরে টিপে ধরে রেখে বললে—না কমলা দেবী, ও আপনি কিছুতেই মুছতে পারবেন না—ও আমি আপনাকে কিছুতেই মুঝতে দেবো না—

কমলা দত্ত তখনও লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছে। বললে ছি ছি, কী লজ্জা বলুন তো—

তারপর থেমে বললে—না না, ও আমায় মুছে ফেলতে দিন—

আদিনাথ বললে—কিছুতেই না—

কমলা দত্ত হঠাৎ হাতটা টেনে নিয়ে নিজের চোখ দুটো চাপা দিলে।

তারপর বললে—ছিঃ, আমায় আপনি মুছতে না দেন তো আপনি নিজেই মুছে ফেলুন—

আদিনাথ বললে—না কমলা দেবী, কিছুতেই না—

কমলা দত্ত তখনও নিজের চোখ ঢেকে রয়েছে। বললে—কিন্তু কেন দিচ্ছেন না বলুন তো মুছতে—সত্যি, আমাকে এমন করে লজ্জায় ফেলে আপনার কী লাভ ?

আদিনাথ বললে—থাক, ও-নাম ওখানে অমনিভাবেই থাকবে—আপনি যে একমুহূর্তের জন্যেও মেয়েমানুষ হয়েছিলেনও তার সাক্ষী হয়েই থাক—

কমলা দত্ত বললে—কিন্তু আপনি তো সাক্ষী রইলেনই—

আদিনাথ বললে—বহুদিন পরে যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার—সেদিন আপনার যদি এই দিনের কথা না মনে থাকে, তখন ওই দেয়ালকেই যে আমি সাক্ষী মানবো—

কমলা দত্ত হঠাৎ উঠলো।

বললে—চলুন, আজ যাই—

আদিনাথ বললে—চলুন—

গাড়ির ভেতর বসে আর সারাপথ কিছু কথা হলো না দুজনে। চলতে চলতে গাড়ি এক-সময়ে এসে পৌঁছলো ইস্কুলের দরজার গোড়ায়।

আদিনাথই প্রথমে গাড়ির দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালো। তারপর কমলা দত্তকে হাত ধরে নামিয়ে নিলে।

আদিনাথ বললে—আসছে শনিবার কী আমায় আসতে বলেন?

কমলা দত্ত কী যেন ভাবলে একবার। তারপর যেন কী ভাবতে ভাবতেই বললে—আসছে শনিবার?

কিন্তু সেই মুহূর্তেই দুজনের একসঙ্গে নজরে পড়লো—সেক্রেটারি রামমোহন সেন আপিস-রুমের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে তাদের দিকেই চেয়ে আছেন।

কমলা দত্ত সে-দৃশ্য দেখেই এক নিমেষে মাথা নিচু করে ইস্কুলের দিকে পা বাড়ালো।

আর আদিনাথ? আদিনাথ সেই প্রথম সেক্রেটারিকে চোখে দেখলে। ভাল করে চেয়ে দেখলে। নায়কের যে-সব গুণ শাস্ত্রে লেখা আছে তার সবই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চেহারায়। দানশীল, কৃতী, সুশ্রী, রূপবান, কার্যকুশল, লোকরঞ্জক, তেজস্বী, পণ্ডিত আর সুশীল। চোখ মুখের রেখায় ভর্ৎসনা নেই, ঈর্ষা নেই। আত্মশ্লাঘারহিত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর স্বভাব, মহাবলশালী, স্থির আর বিনয়ী। সেনমশাই-এর সঙ্গে শাস্ত্রের ধীরোদাত্ত নায়কের সমস্ত লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। বাইরে থেকে তার কোনও তফাত নেই যেন।

আর তারপর সেই গাড়িতেই স্টেশনে এসে আদিনাথ আবার কলকাতায় ফিরে গেল।

কিন্তু সেক্রেটারী কিছুই বললেন না। একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলেন না—কমলা দত্তর সঙ্গে যিনি এসেছিলেন সে ভদ্রলোক কে!

কমলা দত্ত বললে—আপনি কি অনেকক্ষণ এসেছেন?

সেনমশাই বললেন—না, কাজ হয়ে গেল, তাই চারটের ট্রেনেই চলে এলাম—

কমলা দত্ত বললে—নতুন বছরের গ্র্যাণ্টটা স্যাংশন হলো?

সেনমশাই বললেন—স্যাংশন হয়ে পড়েই ছিল—শুধু ডিপার্টমেণ্ট থেকে চিঠি ডেসপ্যাচ হতেই যা দেরি হচ্ছিলো—সেইটে একেবারে ইস্যু

করিয়ে নিয়ে এলাম আর কি।

কথাটা বলে সেক্রেটারি নিজের বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন।

কমলা দত্ত অনেকক্ষণ সেইদিকে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে—আমায় কিছু বললেন কি ?

—না—বলে সেক্রেটারি যেমন যাচ্ছিলেন তেমনি চলতে লাগলেন।

কিন্তু শুধু সেইদিনই নয়, এ-সম্বন্ধে কোনওদিনই আর কিছু বললেন না তিনি। তারপর কতদিন গিয়েছে কমলা দত্ত সেক্রেটারির বাড়িতে। কাজের প্রসঙ্গে নানা আলোচনা হয়েছে।

সেক্রেটারি বললেন—কতকগুলো বেঞ্চের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল—সেগুলো কি ডেলিভারি পেয়েছো ?

কমলা দত্ত বললে—কই, না তো—কবে দেবার কথা ছিল ?

এমনি নানা প্রসঙ্গ। কিন্তু কোনদিনই আর সে-প্রসঙ্গ ওঠে না।

বাড়ির ভেতরে যাবার পথে সেনমশাই-এর ছোট মেয়ে মিণ্টুর সঙ্গে দেখা।

কমলা দত্ত জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, তোর মা কী করছে রে ?

মিণ্টু বললে—মা তো ঘুমোচ্ছে—

তারপর হেসে বললে—জানো কমলাদি, মার ছেলে হবে—

—দূর, কে বললে—বলে মিণ্টুকে কোলে তুলে নিলে।

—হ্যাঁ কমলাদি, মেজখুড়ী বলেছে যে—

কমলা দত্ত বললে—চল, আমি তোর মেজখুড়ীর কাছে যাই দিকিনি—

আহ্লাদীমাসীমা তখনও শুয়ে ছিলেন। কমলা দত্তকে দেখে বললেন—ওমা, ও কি রে, ওকে আবার কোলে নিতে গেলি কেন, তোর কাপড় ময়লা করে দেবে যে—

—তা দিক না মাসীমা, কাপড় ময়লা হলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় ?

আহ্লাদীমাসীমা বললেন—ওমা তোর মুখে নতুন কথা শুনছি যে লো—তুই তো কখনও ছেলে-পিলে ছুঁতিস না না আগে—হ্যাঁ রে, বালা-জোড়া কি নতুন গড়ালি নাকি রে?

কমলা দত্ত বললে—গড়াতে যাবো কেন বলো দিকিনি মিছিমিছি, এ বালা-জোড়া তুমিই তো আমাকে দিয়েছিলে, মনে নেই? ছিলই তো বাক্সে পোরা—কী মনে হলো সেদিন তাই পরলুম—

আহ্লাদীমাসীমা বললেন—ভালোই তো মা, পরবে বৈকি, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছো, গয়নাগাঁটি পরবে বৈকি, গয়না না পরলে যে মেয়েমানুষকে নেড়া নেড়া লাগে—

সে-প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যে কমলা দত্ত বললে—কেমন আছো তুমি মাসীমা?

আহ্লাদীমাসীমা চিৎপাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। এ-কথায় হাত-পা আরো ছড়িয়ে দিলেন তাকিয়ার ওপর।

বললেন—কী অরুচি যে হয়েছে মা কী বলবো, এমন আগে কখ্খনো হয়নি, কিছ্ছু পেটে যায় না—মুখে কিছু দিয়েছি কি অমনি সঙ্গে সঙ্গে বমি—শুধু চা গিলে বেঁচে আছি—তা ছাখ না এদের কাণ্ড—এত গণ্ডা লোক রয়েছে বাড়িতে—চারটে বাজতে চললো, এখনও এক বাটি চা পেলাম না মা—এদের আক্কেলটা তুই ছাখ মা—

মাঝে মাঝে রান্না-ঘরের দিকেও যায় কমলা দত্ত।

বলে—কী গো, কেমন আছো মেজদিদিমা—কী খবর তোমাদের—

মেজদিদিমা পিঁড়িটা এগিয়ে দেয়। বলে—এসো মা লক্ষ্মী, এসো—তোমরা বেশ আছো মা, নেকাপড়া নিয়ে বেশ আছো—আমাদের আট বছর বয়েসে বিয়ে হলো, শাঁখ বাজলো—আর দশ বছর যখন বয়েস, মা পুকুরঘাটে নিয়ে গিয়ে হাতের নোয়া শাঁখা, সিঁথের সিঁদুর মুছে দিয়ে কাঁদতে বসলো। বললে—আবাগীর কপাল পুড়লো। তা তিন কুড়ি পাঁচ বয়েস হলো মা—শ্বশুরবাড়ি কী ধন তাও জানতে পারলুম না—সোয়ামী কী দব্য তা-ও বুঝতে পারলুম মা—সেকালে মেয়ে হয়ে জন্মানো পাপ ছিল মা—পাপ ছিল—

আজকাল সমস্ত বাড়িটাতে মাঝে-মাঝে ঘুরে বেড়ায় কমলা দত্ত। ছোটবেলা থেকে এ-বাড়িতেই কমলা দত্ত মানুষ, তবু এ-বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিস যেন আজ নতুন নতুন ঠেকে।

কমলা দত্ত জিজ্ঞেস করে—তুমি কবে এলে ভানু ?

সেক্রেটারির ন মেয়ে ভানু। ভানু বলে—ওমা, কী ভাগ্যি কমলাদির দেখা পেলুম—মাকে বলি তাই, কমলাদি বেশ আছে—ঝাড়া ঝাপটা মানুষ—আমাদের এটার অসুখ সারলো তো ওটা জ্বরে পড়লো, লেগেই আছে—

কমলা দত্ত বলে—পুজোর সময় আসোনি যে সেবার ?

ভানু হাসলো। বলে—তোমার ভগ্নিপতি কি ছাড়ে ভাই, বলে—প্রত্যেক বছরই তো মার কাছে যাও—এবার আমার সঙ্গে দার্জিলিং-এই না-হয় চলো—

কমলা দত্ত বলে—দার্জিলিং গিয়েছিলে বুঝি বরের সঙ্গে—?

ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। দরজা-জানলা বন্ধ করে নিজের ঘরে শুয়ে ছিল কমলা দত্ত। হঠাৎ হুড়মুড় করে ভীষণ বৃষ্টি শুরু হলো। কখন মেঘ করে এসেছিল, কখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল কিছুই টের পাওয়া যায়নি। তারপর আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে সে এক প্রবল বর্ষা। সেই যে একটানা চললো বৃষ্টি আর থামে না।

কমলা দত্তর কী যে হলো—জানলার পাল্লা দুটো খুলে দিলে। জানলার বাইরে যতদূর চোখ যায় শুধু বৃষ্টির অবিরল ধারা। ঝাপসা হয়ে গিয়েছে বাইরের আকাশ, মাঠ, গাছপালা সব। আস্তে আস্তে কমলা দত্তর চারদিকে যেন ভারি এক পর্দা টাঙিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে একলা। কমলা দত্ত একলা হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো নিজেকে। আর আশ্চর্য—সেই সময়ে অতি নিঃশব্দে চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো একটা মুখ।

মুখটা মনে পড়তেই কমলা দত্ত চোখ দুটো ভালো করে দু'হাতে

মুছে নিলে।

তেমনি আবার আর একদিন।

মাঝ-রাত্রে হঠাৎ আচমকা ঘুম ভেঙে গিয়েছে কমলা দত্তর। এমন বড় হয় না। বিছানা থেকে উঠে বাইরে বাথ-রুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে এল কমলা দত্ত। আবার বালিশে মাথা গুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আবার মুখে, চোখে, মাথায় জল ছিটিয়ে দিলে। আবার বালিশে মুখ গুঁজে রইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বাইরে গভীর অন্ধকার। সব নিস্তব্ধ। ছাদের ওপর অনেক উঁচুতে আকাশ দিয়ে বুঝি একটা পাখী উড়ে যাচ্ছিলো। একটা কঁক্ কঁক্ শব্দ কানে আসে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো বেড়ার ধার থেকে একটানা ডেকে চলেছে। কমলা দত্ত জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছে—এই সব শুনছে, এমন সময়—

এমন সময়, আশ্চর্য, অতি নিঃশব্দে চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো একটা মুখ।

সেদিনও মুখটা মনে পড়তেই কমলা দত্ত চোখ দুটো দু'হাতে মুছে নিলে।

কিন্তু পরের শনিবার দিন কমলা দত্তর কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। আজ আদিনাথ না এলেই যেন ভালো হয়। আদিনাথ দু'দিন মাত্র এসেই তাকে যেন আমূল বদলে দিয়ে গিয়েছে। এখন যেন সে অন্য মানুষ। এ ক'দিন ইস্কুলের কথা সে কম ভেবেছে। বাক্স থেকে বালা-জোড়া বার করে পরেছিল, আবার সে দুটো বাক্সে তুলে রাখলে। আর যদি আদিনাথ আসেই তো সুকুমারীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে যেন। সুকুমারী সঙ্গে থাকলে একটু সে সাহস পাবে। নইলে একলা আদি-নাথের কাছে থাকলে তার বুকটা দুর-দুর করে কাঁপবে। সমস্ত শরীরটা তার শির-শির করে উঠবে।

শনিবার দিন দুপুরটা আর কাটতে চায় না। বারোটা বাজলো, একটা বাজলো, দুটো বাজলো, তিনটে বাজলো, চারটেও বাজে-বাজে। এলে এতক্ষণ এসে যেতো। তাহলে আজ আর এল না।

কিন্তু এল আর একটা জিনিস।

এল সুকুমারীর চিঠি।

সুকুমারী লিখেছে—কমলাদি, তোমার চিঠি পেয়ে কী আনন্দই যে পেলাম কী বলবো। তুমি ভালো আছো জেনে সুখী হলাম। ওকে তোমার চিঠিটা দেখিয়েছি। তোমার হাতের লেখার খুব প্রশংসা করলে ও, জানো। আমরা খুব সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তবু ভালো লাগে না কিছু। শনিবারগুলো ও খুব ব্যস্ত থাকে। শনিবারে আমার সঙ্গে দেখা হয় না ওর। গত দুটো শনিবারই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবো ভেবেছিলাম ওকে নিয়ে। কিন্তু ওর নাকি হাতে খুব কাজ ছিল—ব্যাণ্ডেলে যেতে পারবে না বললে। মামার বাড়িতে সংসারের সব কাজ করে আর একটুও ছুটি পাই না। আমি ছিলুম না এতদিন কোনও অসু-বিধে হয়নি। এখন আমি এসেছি আর সবাই হাত গুটিয়ে বসেছে। হাঁড়ি-ধরা থেকে জুতো-সেলাই পর্যন্ত সব। কবে যে এর থেকে রেহাই পাবো কে জানে! আসছে বারোই আমাদের ইস্কুল খুলবে—এগারো তারিখে তিনটের ট্রেনে ওর সঙ্গে গিয়ে পৌঁছুবো— মনীষাদি, মাধুরীদি, লীলাদি আর সকলের খবর কী? কবে আসছে সব? কলকাতায় খুব ব্ল্যাক-আউট শুরু হয়ে গিয়েছে। রাত্রে রাস্তায় বেরোতে গা ছম্ ছম্ করে—রাস্তার আলোগুলোতে সব ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে—চারদিকে ব্যাফল্ ওয়াল তুলেছে। যা হোক আশা করি ভালো আছো···দেখা হবে শিগ্-গির। ইতি···

বারো তারিখে ইস্কুল খুলবে। আবার অনেক কাজ। আবার ঝাড়া-মোছা শুরু হয়ে গেল। সাজো-সাজো রব পড়ে গেল চারিদিকে। কমলা দত্ত আবার হেড মিস্ট্রেস।

সেক্রেটারি বললেন—ছুটির পর ইস্কুল খুললেই এ-আর-পি ক্লাশ শুরু হবে—ট্রেনার আসবে, মনে আছে তো?

কমলা দত্ত জিজ্ঞেস করলে—কবে কবে ক্লাশ হবে?

সেক্রেটারি বললেন—সপ্তাহে একদিন, শনিবার—ইস্কুলের ছুটির পর—

এগারো তারিখেই সব এসে পড়লো হুম-দাম করে। ওরা সব দূর দূর থেকে আসছে—সকলই এসে হাজির। ট্রেনের ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন ছিল। সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে সবাই বিশ্রাম করতে লাগলো।

মনীষা সেন বললে—তোমাকে আমি চিনতেই পারিনি, সত্যি কমলাদি—

কমলা দত্ত হেসে উঠলো।

—কেন রে, এই এক মাসেই এত মোটা হয়ে গেলুম?

—মোটা কেন হতে যাবে, কিন্তু তোমাকে যা সুন্দর দেখাচ্ছে!

লীলা, মাধুরী ওরাও বললে—সত্যি, তোমার চেহারা বদলে গিয়েছে কমলাদি—

কমলা দত্ত বললে—কী বদলালো আমার তা বলবি তো!

মনীষা সেন বললে—তা জানিনে বাপু, কেন জানি না, তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু এবার—

কমলা দত্ত বললে—আগে বুঝি খারাপ দেখতে ছিলুম?

—অতোশতো জানিনে, ভালো দেখাচ্ছে তাই ভালো বলছি—

কমলা দত্ত হেসে ফেললে—তোদের চোখই বদলে গিয়েছে তাই বল্‌—যা কিছু দেখছিস সবই সুন্দর লাগছে—

তিনটের গাড়িতে সুকুমারী এল। সুকুমারীর স্বাস্থ্যটা এবার মামার বাড়িতে গিয়ে ফিরেছে যেন মনে হলো। নতুন চটি কিনেছে। নতুন মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি কিনেছে একটা। আর নতুন একটা চামড়ার স্যুটকেস।

বিছানা-বাক্স এনে রাখা হলো আপিস-রুমের কোণে।

সুকুমারী এসেই হাসিতে গড়িয়ে পড়লো।

—কী চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে কমলাদি, এক মাস দেখিনি—এত ভালো লাগছে তোমাকে যে কী বলবো!

কমলা দত্ত বললে—ভালো ছিলি তো সব?

ঠিক এই সময়ে আদিনাথ এসে ঘরে ঢুকলো।

বললে—নমস্কার—

কমলা দত্তও হাত দুটো তুললো—নমস্কার—

সুকুমারী আদিনাথের দিকে ফিরে বললে—তুমি তা হলে এসো—তোমার তো আবার কাজ আছে বলছিলে—ট্রেনেরও সময় হয়ে যাচ্ছে—

আদিনাথ চলে গেল।

সুকুমারী বললে—আমি যাই কমলাদি,—ট্রেনে কী ভিড় আজকে কী বলবো—একভাবে বসে বসে পিঠ, পেট ব্যথা হয়ে গিয়েছে একেবারে—

কমলা দত্ত ততক্ষণে আবার কাজে মন দিয়ে ফেলেছে। আবার সেই তদারক করা। আবার ক্লাশে-ক্লাশে গিয়ে পড়ানো। কে ফাঁকি দিচ্ছে, কে লেখাপড়ায় মন দিচ্ছে না, কে বাগানের ফুল তুলেছে, কে রাস্তা ঝাঁট দিতে গাফিলতি করেছে। খাবার জল টাটকা তুলেছে কিনা। আবার সেই গার্জেনদের দেখা-সাক্ষাৎ। প্রকাশকদের আবেদন-নিবেদন। আবার পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র তৈরি। টীচারদের মাইনে বাড়ানোর দরখাস্ত। আবার রোজ বিকেলবেলা সেক্রেটারির বাড়িতে গিয়ে রিপোর্ট দিয়ে আসা। কাজের অবধি থাকবে না। দায়িত্বের সীমা পরিসীমা থাকবে না।

আহ্লাদীমাসীমাও বলেন—গরমের ছুটির সময় তবু আসতিস মাঝে মাঝে—এবার তোরও আর দেখা পাওয়া যাবে না—

ভানু বলে—কমলাদি, চললুম ভাই আজ—

—ওমা, এরি মধ্যে চলে যাচ্ছো ? এই তো সেদিন এলে—

ভানু বলে—তোমারই তো টিকির দেখা পাওয়া ভার কমলাদি, তাছাড়া তোমার ভগ্নিপতি লোকটিকে চেনো তো—

—বর বুঝি আবার রাগ করবে তোমার ?

ইস্কুলে এসে কাজের ফাঁকের মধ্যেও মনে পড়ে যায় সেক্রেটারির বাড়ির অন্দর-মহলের কথাগুলো। মেজদিদিমা রান্না-ঘরে রান্না করে আর বলে—তোরা বেশ আছিস লো, আমাদের আট বছর বয়েসে বিয়ে হলো

আর দশ বছর বয়েসে মা আমার হাতের নোয়া আর শাঁখা ভেঙে দিলে পুকুর-ঘাটে নিয়ে গিয়ে, এই তিনকুড়ি পাঁচ বয়েস হলো, শ্বশুরবাড়ি কী সামগ্যি তা-ও বুঝতে পারলুম না, সোয়ামী যে কী দব্য তা-ও জানতে পারলুম না—

সুকুমারী কাজের ভিড়ের মধ্যেই দৌড়ে এসেছে। হাতে একটা দরখাস্ত।

বলে—একটা দিনের ছুটির দরখাস্ত দিলাম কমলাদি—সই করে দাও —তুমি আবার না করো না যেন—

কমলা দত্ত হাসলো।

—কোথায় যাবি রে?

—ওর সঙ্গে এক জায়গায় যাবো কমলাদি।

—কোথায় শুনি? কমলা দত্ত হাসতে লাগলো।

বললে—সিনেমায় বুঝি?

—ওমা, সিনেমায় গেলে ছুটি নেবো কেন?…নেমন্তন্ন আছে।

—দু'জনেরই একসঙ্গে নেমন্তন্ন? বিয়ের নেমন্তন্ন তো রাত্তিরে, দিনের বেলা কী রে?

—রাত্তিরে যে ব্ল্যাক-আউট কলকাতায়—আজকাল তো দিনের বেলায় খাওয়া-দাওয়া—

—তা রাত্তিরে এখানে খাবি তো?

দরখাস্ত সই করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়লে সুকুমারী। বাঙলা ক্লাশ ছিল দোতলায়, টপ টপ করে লাফিয়ে চলে গেল।

যথারীতি আদিনাথের শনিবার আসার কথা আছে। সুকুমারী বিশেষ করে লিখে দিয়েছিল—শনিবার দিনটা ছুটি নিয়েছি, সকাল দশটার গাড়িতেই আসবে তুমি, আমি তৈরি থাকবো—

শুক্রবার দুপুরবেলা কিন্তু হঠাৎ সব বদলে গেল।

কমলা দত্ত ডেকে পাঠালো সুকুমারীকে। কালোর-মাকে ডেকে বললে—সুকুমারী দিদিমণিকে একবার ডেকে দাও তো কালোর-মা—

সুকুমারী আসতেই কমলা দত্ত বললে—এ শনিবার তোমার যাওয়া হবে না সুকুমারী—

সুকুমারী যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—বা রে, কেন, তুমিই তো আমায় ছুটি দিলে কমলাদি কাল?

—ছুটি দিলে কী হবে—সেক্রেটারির নতুন অর্ডার এসেছে আজ—

—কী অর্ডার?

—এ-আর-পি'র ক্লাশ বসবে এখানে, তোমাদের সকলকে থাকতে হবে, কম্পাল্‌সারি—এই দেখ—

সুকুমারী যেন কেমন মন-মরা হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

বললে—বা রে, আমি যে চিঠি লিখে দিয়েছি ওকে আসতে—সব তৈরি, তারা সবাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে আর এখন বলছো কিনা যাওয়া হবে না?

কমলা দত্ত বললে—তা আমার কাছে কাঁদলে কী হবে, আমি কী করবো বল্—?

—তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না কমলাদি—লক্ষ্মীটি, তুমি বললে সব ঠিক হয়ে যাবে—তুমি আমার অবস্থাটা একবার বুঝে দেখো—

কমলা দত্ত বললে—বুঝে আমি দেখেছি সুকুমারী—

আবার নিজের কাজে মন দিলে কমলা দত্ত। তারপর মুখ তুলে দেখে তখনও সুকুমারী দাঁড়িয়ে। চোখ তার ছলছল করছে। যেন এখুনি কেঁদে ফেলবে।

কমলা দত্ত বললে—তোমার কাজ হয়ে গিয়েছে সুকুমারী—তুমি এখন ক্লাশে যাও—মেয়েরা ওদিকে গোলমাল করছে—

সুকুমারীর মনে হলো—কমলাদির গলাটা যেন বড় গম্ভীর-গম্ভীর। এখনই যেন কমলাদির হঠাৎ বড় কাজের চাপ পড়ে গিয়েছে।

সুকুমারী বললে—তবে তুমি ছুটি দেবে না বলছো তাও?

কমলা দত্ত কাজ করতে করতে মুখ তুলে বললে—বার বার এক কথা একশ' বার বলো না সুকুমারী—আমার কাজ আছে—

—কাজ তোমার আছে জানি, এটাও তো তোমারই কাজ। কাজ

নয়, বলো ?

কমলা দত্ত বললে—সামান্য কাজ নিয়ে এত নষ্ট করবার মতো সময় নেই আমার, সেক্রেটারির অর্ডার তোমাকে মানতেই হবে। শুধু সেক্রেটারির নয়, য়ুনিভার্সিটির অর্ডার, গভর্নমেন্টের অর্ডার—

সুকুমারী চুপ করে রইল। কমলা দত্ত খানিক থেমে আবার বললে—সকলেই থাকবে, আমি থাকবো, সেক্রেটারি নিজেও থাকবেন, আর তুমি কী এমন লাট সাহেব হয়েছো যে, থাকতে পারবে না! দু'দিন আড্ডা না দিলে কী হয়? চাকরি আগে না আড্ডা আগে? আমি তো তোমাকে বার বার বলে দিয়েছি, এ ভালো নয়, নিজের ভালো যদি চাও তো এই স্বভাব ত্যাগ করো, ওতে সুখ নেই—

সুকুমারী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে—আজ দশ বছর এমনি মিশছি——এখন বন্ধ করা যায়?

কমলা দত্ত বললে—চাকরি যদি বজায় রাখতে চাও তো বন্ধ করতে হবে বৈকি—আর তা যদি না চাও তো যেখানে ইচ্ছে যাও—গোল্লায় যাও, আমি দেখতেও আসবো না, বলতেও আসবো না—

এতক্ষণে চিৎকার শুনে মনীষাদি, মীরাদি, আরো কয়েকজন টীচার তারাও এসে হাজির হয়েছিল। সবাই দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি শুনছিল। ছাত্রীরাও কয়েকজন লুকিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো।

সুকুমারী আর কিছু না বলে মাথা নিচু করে চলে গেল।

কমলা দত্ত সকলকে উদ্দেশ করে বললে—তোমাদের সকলকেই আমি বলছি—এ-ইস্কুল সামান্য একটা ইস্কুল-মাত্র নয়, একে তোমরা আশ্রম বলে মনে করবে, এখানে তুমি, আমি, সেক্রেটারি সবাই সেবা করতে এসেছি, ছাত্রীদের সেবা, দেশের সেবা, দশের সেবা—মনুষ্যত্ব-লাভের দুঃসাধ্য সাধনা আমাদের। আগে সেবা তারপরে নিজেদের স্বার্থ—এ যদি না মনে করি তো এ-ইস্কুল উঠিয়ে দেওয়াই ভালো, গোটাকতক শব্দ শিখিয়ে, শব্দের মানে শিখিয়ে আর পরীক্ষায় ছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেশের কিছু মঙ্গল হবে না—এ-কথা তোমাদের আমি অনেকবার বলেছি, আবার আজো বলছি—

সন্ধ্যে বেলা কমলা দত্ত সুকুমারীর ঘরে গেল। সুকুমারী তখনও মুখ গোমড়া করে বসে আছে।

কমলা দত্ত হাসতে হাসতে বললে—রাগ পড়েছে মেয়ের?

সুকুমারীর চোখে এতক্ষণ জল ছিল না। কিন্তু এবার আর বাঁধ মানলো না।

বললে—আমাকে তুমি তা বলে সকলের সামনে অমনি করে বলবে কমলাদি?

কমলা দত্ত সুকুমারীর চোখ মুছিয়ে দিলে নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে।

বললে—হতিস হেড মিস্ট্রেস আমার মতো তো বুঝতিস আমার দায়িত্বটা—

সুকুমারী কাঁদতে কাঁদতে বললে—ও এলে আমি কী বলবো বলো কমলাদি?

কমলা দত্ত হাসতে হাসতে বললে—আর সেক্রেটারিকে আমি কী জবাবদিহি করবো বলতে পারিস? সেক্রেটারি যখন জিজ্ঞেস করবেন সুকুমারী বসু আসেনি কেন—তখন আমি কী বলে তাঁর মুখ ঠেকাবো বল্ তো?

সুকুমারী আপন মনেই যেন বলতে লাগলো—নিজের বাপ-মা নেই কিনা তাই আমাকে চাকরি করতে আসতে হয়েছে, বাপ-মা থাকলে কি আমাকে বাড়ি ছেড়ে এতদূরে চাকরি করতে আসতে হতো ভেবেছো?

কমলা দত্ত আবার সুকুমারীর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললে—তা চাকরি মনে করলে খারাপ লাগবেই তো, চাকরি মনে করিস কেন তুই? আমি কি তোদের সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করি? না কারো সঙ্গে করতে দেখেছিস আমাকে? আর বাপ-মা'র কথা বলছিস, বাপ-মা কারো চিরকাল থাকে না—আমারই কি আছে?

সুকুমারী যেন এবার অনেকটা সান্ত্বনা পেলে।

কমলা দত্ত বললে—নে, ওঠ, খাবি চল্—তুই না খেলে আমিও খাবো না—

সেদিন সকালেও কমলা দত্তকে সেক্রেটারি বলে দিয়েছেন আজকে এ-আর-পি ক্লাশে সবাই থাকছে তো ?

কমলা দত্ত মাথা নেড়ে জানিয়েছে—হ্যাঁ, সবাই থাকবে।

সেক্রেটারি আবার বলেছেন—ক্লাশে-ক্লাশে সারকুলার দেওয়া হয়েছে ? সবাইকে সারকুলারে সই করিয়ে নিয়েছো তো ?

এবারেও কমলা দত্ত মাথা নেড়ে বলেছিল—হ্যাঁ, সই নিয়েছি—

কিন্তু এ-সব কথা আদিনাথ জানতো না কিছুই। সুকুমারীর চিঠি-মতো সকাল দশটার গাড়িতেই শনিবার দিন এসে হাজির হয়েছে একেবারে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে। হেড মিস্ট্রেসের ঘরে যখন ঢুকলো তখন কমলা দত্ত এক মনে কাজ করছে।

আদিনাথ নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে—নমস্কার মিস দত্ত—

—ও আপনি ? আপনি যে আজ এত সকাল-সকাল ?

আদিনাথ বললে—কেন, সুকুমারী আপনার কাছ থেকে ছুটি নেয়নি ? আমাকে চিঠি লিখেছে যে, ছুটি হয়ে গিয়েছে তার ?

কমলা দত্ত তেমনি গম্ভীরভাবেই বললে—ছুটি হয়েছিল, কিন্তু পরে ক্যান্সেল্ হয়ে গিয়েছে—

—সে তো আমি জানতুম না। কিন্তু হঠাৎ ক্যান্সেল্ হলো কেন ?

কমলা দত্ত বললে—আজকে ছুটির পর আমাদের নতুন এ-আর-পি ক্লাশ বসছে, তাই। প্রত্যেক শনিবারে-শনিবারেই বসবে—সেইজন্যে সকলকেই জয়েন করতে হবে—গভর্নমেণ্টের অর্ডার—সকলের পক্ষেই কম্পাল্‌সারি—

আদিনাথ এরপরে আর কোনও কথাই বলতে পারলে না।

শুধু বললে—এ-কথাটা আমাকে আগে জানালে আর কষ্ট করে এতদূর আসতুম না—

কমলা দত্ত বললে—তা তো বটেই, সুকুমারীরই চিঠি লেখা উচিত ছিল আপনার কাছে—

আদিনাথ বললে—একবার এক মিনিটের জন্যে সুকুমারীকে একটু

ডাকতে পারেন—

কমলা দত্ত বললে—নিশ্চয়ই—

বলে ডাকলে—কালোর-মা—

কালোর-মা আশেপাশে কোথাও বুঝি ছিল না। বার দুই ডাকতেও সাড়া পাওয়া গেল না।

বললে—একটু বসুন, আমি এখুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি—

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। সেদিন একসঙ্গে ব্যাণ্ডেলের পুরনো গীর্জা দেখে আসার শেষে সেক্রেটারির মুখোমুখি ধরা পড়ে যাবার পর আর কী ঘটলো জানা হয়নি। এক কমলা দত্ত ছাড়া আর কারো কাছ থেকে সে-কথা জানবার উপায়ও নেই। সুকুমারী তো সেদিনের ঘটনা কিছুই জানে না।

হঠাৎ আদিনাথ এক সময়ে নিস্তব্ধতা ভাঙলে। বললে—সেদিন অনেক কষ্ট করে আমাকে পুরনো গীর্জা, জুবিলী ব্রিজ সব কিছু দেখিয়েছিলেন তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবারও সময় পাইনি সেদিন—

কমলা দত্ত গলাটা নিচু করেই যেন বললে—না, কষ্ট আর কী—আমারও তো দেখা ছিল না—দেখা হলো—

আদিনাথ বললে—তারপরে আর কোনওদিন ওখানে গিয়েছিলেন নাকি ?

কমলা দত্ত শুধু বললে—না, আর সময় পাইনি—

আদিনাথ বললে—আমি একদিন যাবো আবার—

—আবার যাবেন ?

—হ্যাঁ, এবার একলাই যাবো—

—কেন ?

—আর কখনও যাবার সুযোগ না-ও তো পেতে পারি—আর তা ছাড়া—

একটু থেমে আদিনাথ আবার বললে—আর তা ছাড়া—আমার কাছে ও-জায়গাটা তো স্মরণীয়ই হয়ে রইল—

হঠাৎ সুকুমারী ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেছে। বললে—এসে গিয়েছো ?

ভালোই হয়েছে—আমি চট্ করে শাড়িটা বদলে আসি—

বলে তখুনি এক ছুটে আবার ভেতরে চলে গেল।

ঘটনাটায় কমলা দত্ত যতটা না অবাক হয়েছে তার চেয়ে আরো অবাক হয়ে গিয়েছে আদিনাথ।

আদিনাথ বললে—তবে যে আপনি বললেন সুকুমারী যাবে না আজকে?

কমলা দত্ত আপন মনেই কী যেন একটু ভেবে নিলে। তারপর বললে—না, আমি ঠিকই বলেছি—ওর যাওয়া হবে না আজ—

—কিন্তু ও তো যাবার জন্যেই তৈরি হতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারী শাড়ি বদলে আবার এসেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে—কমলাদি আমি চললুম—

কমলা দত্ত স্থির দৃষ্টিতে চাইলে সুকুমারীর দিকে। বললে—তোমার যাওয়া হবে না সুকুমারী—

—কিন্তু আপনি তো আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন—আমি তো বে-আইনী কিছু করছি না—

—হ্যাঁ, বে-আইনী কাজই করছো—

—না, বে-আইনী কিছুই করছি না আমি—

কমলা দত্ত সুকুমারীর এতটা দৃঢ়তায় একটু যেন অবাক হলো।

তারপর বললে—নিজের যদি ভালো চাও তো আমি বলছি, আমার কথা শোনো—বরং তার বদলে সোমবার কি মঙ্গলবার ছুটি নিও—সে-দিন যেও—

সুকুমারী তবু জিদ করতে লাগলো।

—না কমলাদি, আমি যখন ওকে একবার আসতে বলেছি তখন আজ আমি যাবোই—

কমলা দত্ত এবার আদিনাথের দিকে ফিরলে।

বললে—আপনি কি ওকে আজ সত্যিই নিয়ে যাবেন?

আদিনাথ কিছু বুঝতে পারলে না, কী উত্তর দিতে হবে বা কী উত্তর দেওয়া ভালো তার পক্ষে।

কমলা দত্ত বললে—ওর না হয় দায়িত্বজ্ঞান নেই, কিন্তু আমাকে তো ইস্কুল চালাতে হয়—সেক্রেটারির স্ট্রিক্ট্ অর্ডার আছে সবাইকে জয়েন করতে হবে। এর পরেও যদি ওকে নিয়ে যান তো ওর চাকরির ক্ষতি হবে কিন্তু—

সুকুমারী বললে—কিন্তু আমার ছুটি তো স্যাংশন হয়েই গিয়েছে—

কমলা দত্ত এবারও আদিনাথের দিকে ফিরে বললে—ছুটি স্যাংশন হয়ে গেলেও এমারজেন্সি কারণের জন্যেই সে-ছুটি ক্যান্সেল্ও করে দিয়েছি—এর পরেও যদি ও যায় তা হলে আমার আর কোনও দায়িত্বই রইল না জানবেন—

আদিনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

সুকুমারী বললে—চলো যাই—ট্রেনের টাইম চলে যাচ্ছে ওদিকে—

কমলা দত্ত বললে—এ-কথা শুনেও কি আপনি ওকে নিয়ে যাবেন?

আদিনাথ একটু ভেবে বললে—সুকুমারী যদি নিজেই যেতে চায় তো আমার নিয়ে যেতে কোনও আপত্তি নেই—

সুকুমারী বললে—চলো তা হলে, দেরি হয়ে গেল যে—

এতক্ষণে আশেপাশেও কিছু লোক জড়ো হয়েছিল। সকলের সামনে দিয়েই সুকুমারী গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল।

আদিনাথকেও পেছন-পেছন যেতো হলো। যাবার সময় শুধু বললে —আচ্ছা আসি তা হলে, নমস্কার—

বললাম—তারপর?

আদিনাথ বললে—তারপর আর কিছু জানি না—সুকুমারীকে নিয়ে ট্রেনে চড়ে চলে এসেছিলাম, আবার যথারীতি শেষ ট্রেনে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ইস্কুলের দরজা পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে এসেছি।

তবে এটুকু বুঝেছি যে, সেদিন যে কমলা দত্তকে নিয়ে একই ঘোড়ার গাড়িতে জুবিলী ব্রীজ দেখেছি, পুরনো গীর্জা দেখেছি—একসঙ্গে পাশাপাশি বসে অতোক্ষণ সন্ধ্যে পর্যন্ত গল্প করেছি, সে-সব কথার একবর্ণও

কমলা দত্ত সুকুমারীকে বলেনি আর সামার ভেকেশনের সময় আমার সেই ব্যাণ্ডেলে যাওয়া—সে খবরটাও সুকুমারীকে বলেনি কমলা দত্ত।

কিন্তু সুকুমারীর কাছে সে-খবর আর চাপাও রইল না বেশি দিন।

কমলা দত্ত বলেনি বটে—কিন্তু বললে আর একজন···

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

রবিবার সুকুমারী ফিরতেই কমলা দত্ত বললে—তুই দেখছি আমারও নাম ডোবাবি, ইস্কুলেরও নাম ডোবাবি—আজ এ-আর-পি ক্লাশে তোকে না দেখতে পেয়ে সেক্রেটারি ভীষণ রাগ করলেন—আমাকে যা-নয়-তাই বললেন—

সুকুমারী বললে—সেক্রেটারি রাগ করলেন তো বয়েই গেল আমার, তুমি না রাগ করলেই হলো কমলাদি!

কমলা দত্ত বললে—কিন্তু তোদের এত কিসের টান বলতে পারিস?

সুকুমারী হেসে বললে—সে তুমি বুঝবে না কমলাদি—

কমলা দত্ত হাসলো।

—সে কি রে, বুঝবো না আমি, কী বলিস তুই?

সুকুমারী বললে—তুমি যদি কাউকে ভালোবাসতে তো বুঝতে পারতে ঠিক···

কমলা দত্ত হো-হো করে হাসতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়লো। পর্তুগীজ চার্চের বাগানে বসে সেদিন আদিনাথ বলে-ছিল—আপনি বোন হোন, মা হোন, স্ত্রী হোন—আপনি মেয়েমানুষ হোন—মেয়েমানুষ কি আপনি হতে পারেন না?

কথাটা ছাঁত্ করে বাজলো বুকের ভেতর।

বললে—আমিও তো তোদের সকলকে ভালোবাসি, ইস্কুলের এই পাঁচশ মেয়ে—সকলের ভালো-মন্দের কথা চিন্তা করি—সেও তো এক-রকমের ভালোবাসা, আরো মহৎ আরো উদার—

সুকুমারী বললে—আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করে পারবো না কমলাদি—তুমি আমায় যতই বোঝাও—তা বলে এ আর সে?

বলে প্রচুর হাসতে লাগলো।

পরের দিন ইস্কুলের ছুটির পর যথারীতি গাড়ি এসেছে।

কালোর-মা বললে—চা খেয়ে গেলে না বড়দিদিমণি—চা যে হয়ে গিয়েছে—

কমলা দত্ত বললে—থাক, সেক্রেটারির বাড়ি গিয়েই একেবারে চা খাবো—দেরি হয়ে গিয়েছে আমার—

বাইরে গিয়ে গাড়িতে উঠতে যথারীতি জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলে গাড়োয়ান। চেনা গাড়োয়ান। নিত্য-নিয়মিত হেড মিস্ট্রেসকে নিয়ে সেক্রেটারির বাড়ি যেতে হয়। গাড়োয়ান কোচ-বাক্সে উঠেই গাড়ি ছেড়ে দিলে।

কিন্তু মোড়ের মাথায় আসতেই হেড মিস্ট্রেস হুকুম দিলে—ওদিকে নয়—ডানদিকের সড়ক ধরে চলো—

হুকুম তামিল করাই গাড়োয়ানের কাজ। সুতরাং কোনও আপত্তি করলে না সে। গাড়ি চলতে চলতে সোজা পর্তুগীজ গীর্জার কাছে যেতেই হেড মিস্ট্রেস হুকুম দিলে—থামো—

দরজা খুলে দাঁড়াতেই কমলা দত্ত নামলো।

ফটকের কাছে সেই বিরাট জাহাজের মাস্তুলটা। তার পাশ দিয়ে বাগান। তারপর অনেক দূরে গীর্জার বড় হল্‌টা। ওদিকে না গিয়ে কমলা দত্ত বাঁ-দিকে ঘুরলো। সেদিনকার মতোই নির্জন নিরিবিলি চারিদিক। তবু চারিদিক একবার দেখে নিলে কমলা দত্ত—কেউ কোথাও দেখছে কি না। তারপর আস্তে-আস্তে সেদিনের সেই সিঁড়িটা দিয়ে উঠলো। দু'-পাশের শ্যাওলা-ধরা দেয়াল। মাথায় ছাদ নেই। তারপর সেই চাতাল।

চাতালের সামনের দেয়ালের দিকে একমনে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখলে কমলা দত্ত।

মোটা শ্যাওলার ওপর তার নিজের হাতে লেখা নামটা এখনও স্পষ্ট, এখনও উজ্জ্বল। স্পষ্ট লেখা রয়েছে—'আদিনাথ'। সেদিন নিজের অজ্ঞাতেই সে কখন কথা বলতে বলতে নামটা লিখে ফেলেছিল। আজ কিন্তু আর অজ্ঞাতে নয়। আজ সজ্ঞানেই সেই লেখাটার ওপর নিজের আঙুলটা আর একবার বুলিয়ে দিলে। জোরে-জোরে বুলিয়ে দিলে।

তারপর—

তারপর তেমনি নিঃশব্দেই আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল কমলা দত্ত। আর তার পরেই গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে বললে—চলো—

সেক্রেটারি তখন প্রস্তুতই ছিলেন। কমিটীর অন্য মেম্বররাও বসে-ছিলেন ঘরে।

কমলা দত্তও একধারে গিয়ে বসলো।

ব্রাহ্ম সরলবাবু বললেন—কমলা দেবীর আজকে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে আসতে—

তারকবাবু তখনও পুরনো কথার জের টেনে বলছেন—বিদ্যাসাগর মশাই দেশের নারীদের শিক্ষার জন্যে যা করেছেন কেশব সেন তার কিছুই করেননি—

সরলবাবু বললেন—আপনি ব্রহ্মানন্দর জীবনীই জানেন না তারক-বাবু। সিঁদুরেপটিতে যখন গোপাল মল্লিকের বাড়িতে ব্রহ্মানন্দর বক্তৃতা হয় তখন সস্ত্রীক বড়লাট আর ছোটলাট সে-বক্তৃতা শুনতে আসেন—কম কথা!

তারকবাবু বললেন—হচ্ছে নারী-শিক্ষার কথা আর আপনি তুললেন ছোটলাট বড়লাটের কথা—নিন এখন—

সরলবাবু বললেন—তা যদি বলেন—যখন ব্রহ্মানন্দ বিলেত থেকে এলেন—এসে Indian Reform Committee করলেন, তার তো প্রথম কথাই ছিল—স্ত্রী-বিদ্যালয়—

তারকবাবু বললেন—ওদিকে দেখুন তো বিদ্যাসাগর মশাই। তাঁর মেয়েদের ইস্কুলে নিয়ে যাবার গাড়ির দু'পাশে লেখা থাকতো কী জানেন —লেখা থাকতো—'কন্যামেব্য পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ'—

সেক্রেটারি বললেন—এইবার আপনারা একটু চুপ করুন, আমাদের আসল কাজের কথায় আসা যাক—আপনারা জানেন, প্রত্যেক প্রতি-ষ্ঠানের সার্থকতার মূলে থাকে ডিসিপ্লিন—নিষ্ঠা আর নিয়মানুবর্তিতাই

সব রকম কাজের সাফল্যের মূল। আপনাদের বিদ্যাসাগরই বলুন আর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনই বলুন—এ ব্যাপারে সবাই একমত—

সরলবাবু বললেন—তা তো বটেই—

সেক্রেটারি আবার বলতে শুরু করলেন—আজ আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের এমনি এক নিয়মানুবর্তিতার অভাবের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করেছি—সুকুমারী বসু নামে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন তিনি আমার আদেশ অমান্য করে···

কমলা দত্ত চুপ করে শুনছিল। সেক্রেটারির সমস্ত কথা কানে যাচ্ছিলো না এমন নয়, কিন্তু চুপ করে শোনা ছাড়া আর কোনও করণীয় কর্তব্যই তার ছিল না যেন। কমলা দত্ত লক্ষ্য করেছে—প্রতিদিন প্রতি শনিবার সুকুমারীর যেন নেশা লাগে। সেদিন সুকুমারী ভালো করে মন দিয়ে পড়াতেও পারে না লক্ষ্য করেছে কমলা দত্ত। আদিনাথ আসে। এসে বসে সামনে। তারপর এক সময়ে চোখের সামনে দিয়েই চলে যায় ওরা। নেশার ঘোরে সমস্তটা দিন যখন এক সঙ্গে কাটিয়ে রাত্রে একলা ফিরে আসে সুকুমারী তখনও যেন হাসিতে উচ্ছল, আবেগে উদ্দাম। আদিনাথের কথা বলতে পেলে আর কিছু চায় না যেন সুকুমারী।

আহ্লাদীমাসীমাকেও তো দেখে আসছে। এত যে শরীর খারাপ, খেটে-খেটে গতর গেল-গেল করে—তবু আঁতুড়-ঘরে গিয়ে দেখেছে যেন সে অন্য চেহারা।

আঁতুড়-ঘরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকেন আহ্লাদীমাসীমা। দশটা ঝি সেবা করে। এবার ছেলে হয়েছে। ভারি আনন্দ।

কমলা দত্ত জিজ্ঞেস করে—কেমন আছো মাসীমা?

আহ্লাদীমাসীমা চিঁ চিঁ করে—দ্যাখ মা দ্যাখ, আঁতুড়ে পড়ে আছি বলে কেউ গ্রাহ্যিই করে না—

—কী, হলো কী মাসীমা?

—সকাল থেকে পই-পই করে বলছি, তবু বাসী মুখে এখনও চা পড়লো না মা, তুই এসেছিস, আমার সুখ দেখে যা তুই—পয়সা খরচ করে কত সুখে আছি দ্যাখ—

কিন্তু কমলা দত্ত লক্ষ্য করে—ছেলে হওয়ার গর্বে আহ্লাদীমাসীমার চোখ যেন জ্বলছে।

এবার মান্নু এসেছে বাপের বাড়িতে। কমলা দত্তর চেয়ে অনেক ছোট। এই সেদিন বিয়ে হলো।

—কেমন আছো কমলাদি?

কমলা দত্ত বলে—তুমি কবে এলে মান্নু?

মান্নু হাসতে-হাসতে বলে—এই তো কাল—

কমলা দত্ত জিজ্ঞেস করে—হঠাৎ যে এলে?

হাসতে-হাসতে মান্নু বলে—আমারও যে হবে···

হঠাৎ সেক্রেটারি বললেন—তোমার কি মত কমলা?

কমলা জীবনে কোনোদিন সেক্রেটারির বিরুদ্ধাচরণ করেনি। আজও শুধু মাথা নাড়লে।

আস্তে-আস্তে আবার গাড়ি করে ফিরে এল বোর্ডিং-এ। মনীষা, মীরা, মায়া ওরা তখন গল্প করছে। তরকারি কোটা হচ্ছে। মীরা কমলা দত্তকে দেখে বললে—কুমড়োতে কি ছোলা দেওয়া হবে কমলাদি?

কিছু না বলে কমলা দত্ত সোজা নিজের ঘরে চলে এল।

সুকুমারী সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে এসেছে। বললে—তোমার কি শরীর খারাপ কমলাদি?

কমলা দত্ত হঠাৎ রেগে আগুন হয়ে উঠলো।

—তুই চলে যা আমার ঘর থেকে, বেরিয়ে যা—বেরো আমারসামনে থেকে—

হঠাৎ কমলাদির কেন এমন মেজাজ হয়ে গেল সুকুমারী কিছু বুঝতে পারলে না।

বললে—তোমার মাথাটা একটু টিপে দেবো কমলাদি?

কমলা দত্ত এবার সোজা উঠে বসলো। বললে—যা বলছি, শুনতে পাস না নাকি, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে—বেরিয়ে গেলি—

আদিনাথ বললে—আমি তখন এ-সব ঘটনার কিছুই জানি না। শনিবার দিন কমলা দত্তর মত না থাকা সত্ত্বেও স্কুমারীকে নিয়ে সেই যে বেরিয়েছিলুম আবার যথারীতি হোস্টেলে রেখে দিয়ে এসেছি। তারপর পরের শনিবারের আগে ছুটো দিন আমার নানান কাজ। নিজের ব্যবসা তো আছেই, তা ছাড়া রমা আছে, রমলা আছে, সুতপা আছে, সুপ্রীতি, কত কে! কোথাও গিয়ে গান শুনি, কারো গয়নার প্রশংসা করি, কারো রূপের তারিফ করতে হয়। কারোর কাছে গিয়ে শুধু টাকার গল্প শুনতে হয়। সময় আমার খারাপ কাটে না!

হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পেলাম স্কুমারীর কাছ থেকে।

লিখেছে—টেলিগ্রাম পেয়েই চলে আসবে—আমি কলকাতায় যাবো—আমার চাকরি চলে গিয়েছে!

জানতাম এমন একটা কিছু ঘটবেই। জানতাম—এর জন্যে দায়ী স্কুমারী নয়, কমলা দত্ত নয়। দায়ী আমিই। সেদিন কমলা দত্তকে ভুলিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়াটাই হয়েছিল আমার অপরাধ। মনে-মনে হাসিই পেলো একটু।

মীরা বললে—তুই ক্ষমা চা না গিয়ে স্কুমারী—কমলাদি তো আমাদের মায়ের মতন—দোষ কী!

স্কুমারীরও গোঁ কম নয়। বলে—কেন, আমি কেন ক্ষমা চাইতে যাবো শুনি।

মনীষাদি বললে—এখন চাকরি যাওয়া কি ভালো—যুদ্ধের জন্যে চারদিকে সব ইস্কুল-টিস্কুল তো বলে বন্ধই হয়ে যাচ্ছে—

মায়াদি বললে—আর তা ছাড়া বসে-বসে আমাদের কে খাওয়াবে বলো না—মাস গেলে একশ' তিরিশটা টাকা, আমাদের কে আছে মাথার ওপর বলো—

সরলাদি বললে—এই তো সামনে পূজো আসছে। সবাই হাঁ করে বসে আছে সেখানে। কাউকে যদি জামা-কাপড় কিছু না দিতে পারি তো সবার মুখ ভার, আর দিতে পারলেই তুমি ভালো—

মনীষাদি বললে—সংসারের নিয়মই তো এই—এই মাইনের টাকা

দেশে যাবে তবে গয়লা, ধোপা, মুদির দেনা সব শোধ হবে—চাকরি করতে কার সাধ ভাই—

কালোর-মা চুপিচুপি আসে ঘরে। গলা নিচু করে বলে—কী হয়েছে গো দিদিমণি?

সুকুমারী চুল এলো করে বসেছিল। বললে—কীসের কী হবে কালোর-মা?

কালোর-মা বলে—কিছু হয়েছে বুঝি?

—কেন, কিছু তো হয়নি।

কালোর-মা বলে—তবে যে দেখলুম, বড়দিদিমণি কাঁদছিল—

আহ্লাদীমাসীমা মেয়েদের জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ লা, কমলা মেয়েকে দেখছি নে যে কতদিন—আর আসে না বুঝি?

আঁতুড়-ঘর সাফ করে মাসীমা আবার নিজের ঘরে ঢুকেছে। ষষ্ঠী পূজো হয়ে গিয়েছে। তবু ন্যাতা-জোবড়া হয়ে থাকে। গায়ের কাপড়ের ঠিক থাকে না। বলে—পয়সা খরচ করে লোক রেখে আমার তো ভারি সুখ—বাসি মুখে আমার এখনও চা পড়লো না মা—ভূতের সংসার হয়েছে আমার—

কমলা দত্ত সেদিন এল। বললে—আমায় ডেকেছো মাসীমা—

আহ্লাদীমাসীমা চিৎপাত হয়ে শুয়ে ছিল। গায়ের কাপড়টা টেনে দিলে ঝি।

আহ্লাদীমাসীমার মুখে হাসি ফুটলো। বললে—খুব মেয়ে যা হোক, খোকাকে একবার দেখতে পর্যন্ত এলিনে তুই—তোর ওপর খুব রাগ করেছে খোকা জানিস, দেখছিস কেমন চেয়ে-চেয়ে দেখছে তোর দিকে—এখন থেকেই খুব বুদ্ধি হয়েছে ওর—দেখছিস—

এইটুকুন ছেলের কেমন বুদ্ধি হয়েছে সে-গল্প আর শোনা হলো না।

আহ্লাদীমাসীমা বললে—ওমা, তোর মুখ অতো ভার-ভার কেন রে—কী হয়েছে?

কমলা দত্ত বললে—হবে আবার কী মাসীমা, ইস্কুলের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরলুম একেবারে—

আহ্লাদীমাসীমা গালে হাত দিলে।

বললে—ওমা, কী বলিস যে, তোর কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়, মাইরি কমলা, আমার মতন বছর-বছর তোর আঁতুড়-ঘর করতে হতো তো বুঝতিস—আমাকে দে না তোর ইস্কুলে বসিয়ে, আমি বাঁচি। এই এতক্ষণ বেলা হলো এখনো একবার চা পেলুম না মা—

আহ্লাদীমাসীমার পর আবার মানু আঁতুড়-ঘরে ঢুকেছে।

রান্না-ঘরে মেজদিদিমা বলে—এই দেখো মা, কী কপাল করেই এই-ছিলাম—নিজের আঁতুড় তো হলো না, খালি পরের আঁতুড় ঠেলতে-ঠেলতেই জীবন গেল—

সেদিনও কমলা দত্ত নিজের আপিস-ঘরে বসে ছিল।

হঠাৎ আদিনাথ ঘরে ঢুকলো।

মুখ তুলে চেয়ে কমলা দত্ত বললে—সুকুমারীকে নিতে এসেছেন?

আদিনাথ বললে—হ্যাঁ, হঠাৎ ওর টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছি—

কমলা দত্ত বললে—কিন্তু আজকে কি না গেলেই নয়? আমার মতে আরো কিছুদিন এখানে থাকলে ভালো হয়—সেক্রেটারিকে আমি নিজে বুঝিয়ে একটু বলতুম—

আদিনাথ খানিক চুপ করে থেকে বললে—তা কি জানি, যা ভালো বোঝেন করুন—

কমলা দত্ত বললে—অথচ দেখুন, সেদিন আমি অতো করে বললুম, এ-আর-পি'র ক্লাশ, কম্পাল্‌সারি, শুনলে না আমার কথা—সেক্রেটারি সিরিয়স স্টেপ নিলেন। বললেন—এ-রকম স্ট্রিক্ট্ না হলে সবাই আস্কারা পেয়ে যাবে—

আদিনাথ এবার সোজাসুজি মুখ তুলে চাইলে কমলা দত্তর দিকে।

বললে—ওটা তো হলো উপলক্ষ্য—আসল কারণটা তো আলাদা—

কমলা দত্ত চমকে উঠলো। বললে—সে কি, কেন, আলাদা কেন? আসল কারণটা কী?

আদিনাথ বললে—আসল কারণটা তো আপনাকে নিয়ে সেই

সেদিন বেড়াতে বেরোনো—সে আপনি ভালো করেই জানেন—

কমলা দত্ত মাথা নিচু করলে হঠাৎ। তারপর বললে—না না—আপনার এ ভুল ধারণা—

আদিনাথ বললে—না, ধারণা আমার ঠিকই, এর জন্যে দায়ী সুকুমারীও নয়, আপনিও নন, এমন কি সেক্রেটারিও নন—আসলে আমিই দায়ী, তা-ও জানি—কিন্তু সেদিন কি আমি সত্যিই কোনও অন্যায় আচরণ করেছি যার জন্যে এক তৃতীয় ব্যক্তিকে আজ এই শাস্তি পেতে হলো ?

কমলা দত্ত এবারও মুখ নিচু করে বললে—না না, আপনি ভুল বুঝবেন না—আর সেই জন্যেই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আজকে ওকে নিয়ে যাবেন না—দু-একদিন রেখে দিন, দেখি কী করতে পারি—

আদিনাথ বললে—চেষ্টা করতে পারেন—কিন্তু আমার মনে হয় না যে কিছু সুফল হবে—

—অমন ভাবছেন কেন , সুফল হতেও তো পারে।

—হয় যদি ভালো, সুকুমারী পরের বাড়িতে গলগ্রহ, ওখানে ওর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শেষ নেই—এখানে তবু আরামে থাকতো—আপনার ভালোবাসা পেয়েছিল—আপনার নাম করতে ও অজ্ঞান—কিন্তু মাঝ-খানে আমি এসেই সব গণ্ডগোল করে দিলাম—

তারপর একটু থেমে বললে—হয়তো আমার জন্যে আপনাকেও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে সেদিন—

কমলা দত্ত বললে—অমন কথা বলবেন না, ছিঃ, গঞ্জনা আমাকে এমনিতেই পেতে হয়—সেক্রেটারির মুখ থেকে আজ পর্যন্ত আমার নিন্দে ছাড়া কখনও প্রশংসা শুনিনি—

আদিনাথ হাসলো। বললে—তা পাবেনও না, ভালোবাসা দেখাবার পদ্ধতি তো সকলের একরকম নয়—

কমলা দত্ত চুপ করে রইল। কিছু কথা বললে না।

আদিনাথ অনেকক্ষণ পরে আস্তে-আস্তে বললে—সুকুমারীর সঙ্গে-সঙ্গে আমারও বোধ হয় এবার থেকে হুগলী জেলার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক

শেষ হয়ে গেল, তা ছাড়া আর কী উপলক্ষ্য করেই বা আসবো। এখানকার জায়গাগুলোও সব দেখা হয়ে গেল—আর কোনোও উপলক্ষ্যই তো নেই তেমন—

কমলা দত্ত এবারও কোনও উচ্চ-বাচ্য করলে না।

তারপর বললে—কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, ওর চাকরি যাতে থাকে সে-চেষ্টা আমি করবোই—সুকুমারী এখান থেকে চলে গেলে আমারই কি খুব ভালো লাগবে ভেবেছেন···কিন্তু একটা কথা···

বলে কমলা দত্ত চুপ করলে।

আদিনাথ বললে—কী কথা বলুন—

কমলা দত্ত বললে—ও হয়তো রাগ করে আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখবে না আর, কিন্তু পরে যদি দরকার হয় তো একটা অ্যাপীল করতে হতে পারে—ওর হয়ে আপনি তা করতে পারবেন কি ?

আদিনাথ বললে—নিশ্চয় পারবো—

কমলা দত্ত বললে—তা হলে আপনার ঠিকানাটা যদি দয়া করে রেখে যান তো বড় উপকার হয়—

আদিনাথ বললে—সেদিন কমলা দত্তর মুখের দিকে চেয়ে আমার মনে হয়েছিল ঠিকানা নেওয়ার কারণটা যেন একটা উপলক্ষ্য। আসলে শনিবার-শনিবার যে যেতাম সেখানে এটা যেন কমলা দত্তর ভালোই লেগেছে মনে হলো।

কমলা দত্ত এতক্ষণে সুকুমারীকে ডাকতে পাঠালো।

আদিনাথ পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দিয়ে বললে—বাড়ির ঠিকানা নয়, আমার আপিসের ঠিকানাই রইল এতে—

কমলা দত্ত কার্ডখানা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলে।

তখনও সুকুমারী আসেনি।

হঠাৎ আদিনাথের কী খেয়াল হলো কে জানে। জানলার বাইরের দিকে চেয়ে বললে—সেই পুরনো গীর্জার দিকে আর বোধহয় যাবার সময় পাননি আপনি ?

কমলা দত্ত কিছু উত্তর দিলে না।

আদিনাথ বললে—একদিন গিয়েই যে-গঞ্জনা ভোগ করতে হলো—এর পর জীবনে আর কোনও দিন ও-দিকই মাড়াবেন না বোধহয় !

কমলা দত্ত এবারও কোনও উত্তর দিলে না।

আদিনাথ আরো কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ ঝড়ের মতো সুকুমারী ঘরে ঢুকলো। কাঁদো-কাঁদো মুখ। কমলা দত্তর দিকে একবার চাইলেও না। আদিনাথের কাছে এসে বললে—একটু বসো, আমি সব গুছিয়ে রেখে দিয়েছি—যাবো আর আসবো—

কমলা দত্ত এবার গম্ভীর গলায় বললে—সুকুমারী, আজ কি তোমার না-গেলেই নয় ?

সুকুমারী যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো। তারপর পেছন ফিরে বললে—কিন্তু কমলাদি, চাকরি তো চলেই গিয়েছে আমার, আমি কোন মুখ নিয়ে থাকবো এখানে ?

কমলা দত্ত আদিনাথের দিকে চেয়ে বললে—আপনি একটু বলুন ওকে, আপনার কথা ও হয়তো শুনবে—

কিন্তু আদিনাথকে আর কিছু বলতে হলো না। সুকুমারীই বললে—আমি কারোর কথাই আর শুনবো না কমলাদি—এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা মানেই আমার অপমান—

বলে ঘর থেকে আবার ঝড়ের মতোই বেরিয়ে গেল সুকুমারী।

কমলা দত্ত বললে—আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, ভয়ানক মন খারাপ হয়ে গিয়েছে ওর, আপনার ঠিকানাটা তো রইলই আমার কাছে, আমি আপনার কাছে চিঠি লিখবো—

আদিনাথ বললে—আপনি যদি বলেন—আমি এখানে নিজে এসেও আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি—

কমলা দত্ত বললে—তার বোধহয় দরকার হবে না—

আদিনাথ একটু থেমে বললে—এর পর সুকুমারীকে নিয়ে এসে তার

মামার বাড়িতে তুলে দিয়েছি। আমিও নিজের ব্যবসা আর অন্যান্য ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। আর মাঝে-মাঝে সুকুমারীর জন্যে নতুন দু-এক জায়গায় চাকরির দরখাস্ত ছাড়ি। কিন্তু পছন্দ মতো কোনওটাই হয় না।

রোজই গিয়ে আপিসের লেটার-বক্সটা খুলেই প্রথমে দেখি হুগলী থেকে কোনও চিঠি এসেছে কিনা। এদিকে যুদ্ধ তখন পায়ে-পায়ে অনেক দূর এগিয়ে আসছে। সারা কলকাতায় আরো জোর ব্ল্যাক-আউট। জাপানীরা এসে শহরের ওপর পর-পর কয়েকদিন বোমাও ফেলে গেল। অনেক লোক শহর ছেড়ে বাইরে পালিয়েছে।

হঠাৎ একদিন কমলা দত্তর চিঠি পেলাম।

সুকুমারী বললে—ও চিঠির উত্তর দিয়ে কাজ নেই—

আদিনাথ বললে—উত্তর দিলে ক্ষতি কী। উনিই তো নিজে চেষ্টা করছেন—

সুকুমারী বললে—ওঁর চেষ্টায় কিছু হবে না—সেক্রেটারির কথায় কমলাদি ওঠেন-বসেন—ও-ইস্কুলের সেক্রেটারিই সব—

তবু কমলা দত্তর অনুরোধ অনুযায়ী আদিনাথ একটা অ্যাপীলের মতন লিখে পাঠিয়ে দিলে।

সেদিন সেক্রেটারি বললেন—কিন্তু ইস্কুলের সমস্ত আইনকানুন মেনে চলতে হবে এই আণ্ডারটেকিং আমি ওর কাছ থেকে চাই—

কমলা দত্ত বললে—সে তো চাকরি নেবার সময় সকলের কাছ থেকেই আমরা তা সই করিয়ে নিই—আমি নিজেও তো তাতে সই করেছি—

সেক্রেটারি বললেন—তবে তুমি ওর ভার নিচ্ছো?

কমলা দত্ত বললে—পরের বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থাকে, দূর-সম্পর্কের মামার বাড়িতে—অনেকেরই এই রকম অবস্থা—হঠাৎ চাকরি গেলে বড় অসুবিধেয় পড়ে—

সেক্রেটারি বললেন—তা হলে আসছে শনিবার দিন কমিটির মিটিং ডাকো—মিটিং-এ কী ঠিক হয় দেখো—

শনিবার দিন মনীষা সেন বললে—এ শুধু তোমার জন্যেই হলো কমলাদি—

মীরাও বললে—সেক্রেটারির যে হঠাৎ এত দয়া হলো? তুমি বোধহয় সুকুমারীর হয়ে খুব বলেছিলে—

এতদিন সবাই খুব সন্ত্রস্ত হয়েছিল। সুকুমারীর মতো এক কথায় তাদেরও কি চাকরি চলে যাবে নাকি! সুকুমারীর না হয় আদিনাথ আছে। একখানা পোস্টকার্ড লিখলো আর চলে এল সে। কিন্তু তাদের কে-ই বা আছে! আর বেশি দূরও তো নয়। কিন্তু দিনাজপুর কি এখেনে? পাবনা কি এখেনে? খুলনা কি এখানে? কত দূর-দূর জায়গা সব! আসবো বললেই কি আসা হয়, না যাবো বললেই যাওয়া হয়!

কিন্তু সুকুমারীর চাকরি হওয়ার খবর শুনে আবার সবাই আশ্বস্ত হয়।

লীলা জিজ্ঞেস করে—চিঠি চলে গিয়েছে কমলাদি?

কালোর-মা পর্যন্ত জেনে গিয়েছে! বলে—সুকুমারী দিদিমণি আবার ফিরে আসবে বুঝি বড়দিদিমণি!

যখন রাত হয়, অনেক গভীর রাত, তখন এক-একদিন কমলা দত্তর ঘুম ভেঙে যায়। হোস্টেলের সবাই ঘুমোচ্ছে। বাগানের রজনীগন্ধার ঝাড় থেকে তীব্র গন্ধ ভেসে আসে। দূরে কাদের বাড়ির ছাদের পাশে অনেকগুলো বাঁশঝাড় আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে থাকে। তারপর কোন একটা রাতজাগা পাখী ছাদের ওপর দিয়ে কঁক্-কঁক্ করতে-করতে উড়ে যায়। তখন বালিশটা উল্টে নিয়ে আবার ঘুমোতে চেষ্টা করে কমলা দত্ত।

আহ্লাদীমাসীমা চা মুখে দিয়ে থু-থু করে ফেলে দেয়।

—দূর, চা খাচ্ছি না তো ছাই খাচ্ছি—পয়সা খরচ করে লোক রেখে আমার ভারি সুখ হচ্ছে—

মানু আঁতুড়-ঘর থেকে উঠেছে। এবার এসেছে ভানু। ভানু বলে—দার্জিলিং থেকে এসেছি—আর এসেই এই কাণ্ড—পর-পর তিনবার

হলো কমলাদি—আর পারি এই শরীরে ?

আহ্লাদীসীমা বলে—তুমি এই তিনটেতেই অস্থির, আর আমার যে···

মেজদিদিমা রাঁধতে-রাঁধতে গল্পও করে।

বলে—রাধাকিষ্ট আমাদের কুল-বিগ্রহ কিনা, সেই রাধার গল্প বলি শোন,—এখানে বাসুদেব তো কাশীপুরে গিয়ে তপিস্যে করতে লাগলেন। মহামায়ার নাম করে তপিস্যে। সে কি কঠিন তপিস্যি রে—'কিদে নেই, তেষ্টা নেই, তপিস্যে করতে-করতে হাজার হাজার বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলেন না বাসুদেব—তারপর—

কমলা দত্ত বলে—হাজার বছর কি কেউ বাঁচে দিদিমা ?

—বাঁচে রে বাঁচে, এ তো তোর মনিষ্যি নয়, দেবতাদের ব্যাপার, তা শেষে সেই মহামায়া এসে দেখা দিলেন।

বললেন—কী চাও বৎস ?

বাসুদেব বললেন—আমি সিদ্ধি চাই—

মহামায়া বললেন—সিদ্ধি তো অমনি হয় না বাছা, কুলাচার ছাড়া সিদ্ধি হয় না—

কমলা দত্ত জিজ্ঞেস করে—কুলাচার ? কুলাচার মানে কি দিদিমা ?

—কে জানে মা, কুলাচার মানে কী, কথকঠাকুরের মুখে শুনতুম, মনে আছে কথাটা। তা সেই মহামায়া তখন বললেন—লক্ষ্মীকে ছেড়ে মিছিমিছি তপিস্যে করছো তুমি বাসুদেব, ওতে তো সিদ্ধি হবে না—

বাসুদেব তখন বললেন—লক্ষ্মীকে তবে আমি পাবো কি করে ?

মহামায়া বললেন—আমার এই বুকের ওপর যে চিত্তির-বিচিত্তির মালা রয়েছে, এই মালাগুলোই আমার দূতী, তাদের নাম হলো—হস্তিনী, পদ্মিনী, চিত্রিণী, গন্ধিনী। এর মধ্যে আমার পদ্মিনী নামের মালাই ব্রজে গিয়ে রাধা নাম নেবে—বাসুদেব, তুমি মথুরায় গিয়ে পদ্মিনীর সঙ্গলাভ করো—তোমার সিদ্ধি হবে—। তা সে বাসুদেব সেই তো কিষ্ট !

গল্প বলতে-বলতে মেজদিদিমা ডালের হাঁড়িতে কাঠি চালায়।

কমলা দত্ত বলে—থামলে কেন, বলো দিদিমা, তারপর বাসুদেবের সিদ্ধি হলো—?

—হবে না, বাবা রে, রাধার সঙ্গে কুলাচার কি সোজা কথা, কিষ্ট-রাধা কেন, এই যে তুই, এত লেখাপড়া করলি—সিদ্ধি হবে কি তোর? হবে না—তোর যে কুলাচার হয়নি রে—

ও চিঠি পেয়েই মোট-ঘাট নিয়ে সুকুমারী এসে পড়লো একদিন। সঙ্গে আদিনাথ।

কমলা দত্ত বললে—আমার ওপর রাগ পড়লো তোর? বাবা রে বাবা, কী রাগী মেয়ে—

গাড়িতে এসে ক্লান্ত। ঝড়ের মতো ভেতরে চলে গেল।

আদিনাথও চলে যাচ্ছিলো। যাবার আগে একবার থামলো।

বললে—আপনার জন্যেই সুকুমারীর চাকরিটা হলো কিন্তু—ওর হয়ে আজ আমিই আপনাকে ধন্যবাদ দিই—

কমলা দত্ত হাসলো। শুধু বললে—এবার থেকে তো আবার শনি-বার-শনিবার এখানে আসতে হবে আপনাকে—এবার তো আর এড়াতে পারবেন না—

আদিনাথ বললে—কিন্তু শনিবার দিন তো আপনাদের এ-আর-পি ক্লাশ?

কমলা দত্ত বললে—সে ক্লাশ কবে উঠে গিয়েছে, মেয়েদের শেখা হয়ে গিয়েছে সব—

আদিনাথ বললে—বাঁচা গিয়েছে,···কিন্তু এটা আপনি কী বললেন শনিবার-শনিবার আসতে কি আমার কষ্ট হয় মনে করেন?

কমলা দত্ত মুখ নিচু করেই বললে—কষ্ট যে আপনার হয় না, তা আমি জানি—

কী তিনি জানেন আর কী তিনি জানেন না সে-প্রশ্ন আমি সেদিন তুল-

লাম না। তবে ধীরোদাত্ত নায়ক আর শঙ্খিনী নায়িকার বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে রাহুর মতো তখন আমি এসে হাজির হয়েছি এবং আমাকে সরানোর প্রয়োজন যে তখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে—তার প্রমাণ দু'দিন পরেই পাওয়া গেল।

যে-সূর্য প্রতিদিন একই দিকে ওঠে এবং একই দিকে অস্ত যায় তাকে আমরা দেখেও দেখি না। প্রত্যহের প্রয়োজনে তা আমাদের অধিকারবোধের আওতার মধ্যেই এসে যায়। আমরা মনে করি আমাদের প্রয়োজনটাই প্রধান—সূর্যের উদয়-অস্তটা গৌণ।

কিন্তু একদিন সূর্যগ্রহণ হয়। সেদিন হয় ব্যতিক্রম। সেদিনই বাধে বিরোধ। সেদিন আমাদের সমস্ত অধিকারবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের টনক নড়ে।

কমলা দত্তর জীবনেও যেদিন প্রথম সূর্যগ্রহণের লগ্ন এল—যেদিন মিথুনলগ্ন এল—টনক নড়লো রামমোহন সেন-এর। বললেন—ওটা নিয়ম নয়, বেনিয়ম। তাঁর প্রয়োজনকে যখন ক্ষুণ্ণ করেছে তখন তাকে আর বরদাস্ত করা যায় না। রাহুকে বিনাশ করতেই হবে।

কিন্তু রামমোহন সেন ধীরোদাত্ত নায়ক। তাই তিনি ধীর এবং উদাত্ত পন্থাই অবলম্বন করলেন।

এর পর ক'দিনই বা গিয়েছে। ভালো করে ধীরে-সুস্থে গুছিয়ে বসাও হয়নি। একদিন সেক্রেটারি নিজেই ডেকে পাঠালেন।

সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে। সেক্রেটারির বাড়ির ঝি ডাকতে এসেছে! সুকুমারী বসু—বাঙলার টীচার। ডাক পড়েছে তার।

মীরা বললে—ভুল শুনেছো গো তুমি, সুকুমারী নয়—কমলাদিকে—

মনীষা সেন বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ কমলাদিকে। সুকুমারীকে কেন ডাকতে যাবেন সেক্রেটারি মিছিমিছি।

সুকুমারী তবু জিজ্ঞেস করলে—ঠিক শুনেছো, আমার নাম?

ঝি বলে—হ্যাঁ গো দিদিমণি, তোমাকে। বড়দিদিমণিকে আমি চিনিনে আর? আমি কি আজগের লোক গা? কোলে পিঠে করে দত্তবাড়ির সাতটা নাতি-পুতিকে মানুষ করলুম—আমি লোক চিনিনে!

কমলাদি বাথ-রুমে গিয়েছিল। আসতেই সুকুমারী বললে—সেক্রেটারি আমাকে কেন ডাকছেন কমলাদি ?

কমলাদি সব শুনে বললে—তা যাও—যখন ডেকেছেন, কোনও কাজ আছে নিশ্চয়ই—

সুকুমারী বললে—তুমি সঙ্গে চলো না কমলাদি—

—না, সে কি ভালো! তোমাকে ডেকেছেন, তুমিই যাও—কিছু ভয় নেই, খুব ভালো লোক, বোধহয় তোমার ওই ব্যাপার নিয়েই—আর কি!

সেক্রেটারি সেদিন কমলা দত্তকেই বলেছিলেন—এবার ওঁকে সাবধান করে দিয়েছো তো ?

কমলা দত্ত বললে—আমি তো বলেইছি—আপনিও না হয় একদিন ওকে ডেকে বলে দেবেন—আপনার কথা একটু বেশি শুনবে—

সেক্রেটারি শুধু বলেছিলেন—তা আমিও বলতে পারি—বেশ, আমার কাছেই পাঠিয়ে দিও একদিন সময় মতো—

আদিনাথ বললে—মানুষের বাইরেটা যে কতবড় মিথ্যে তা সেইদিনই প্রথম টের পেলাম ভাই। অথচ আমরা বাইরেটা দিয়েই তো মানুষের বিচার করি। বাইরে যাকে দেখেছি বিত্তবান, অন্তরে তার চেয়ে দরিদ্র হয়তো ভূ-ভারতে মেলা ভার। বাইরে যাকে দেখেছি সত্যময়, অন্তরে হয়তো তার মিথ্যাচারের তুলনাও নেই। এমনিভাবেই সংসার চলছে—আরো কতদিন এমনি চলবে কে জানে ?

বললাম—এ তো পুরনো কথা।

—হোক পুরনো কথা। পুরনো বলেই যে নতুন করে তা মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই তা তো নয়। কারণ আমার জীবনে, কমলা দত্তর জীবনে, সুকুমারীর জীবনে এই পুরনো সত্যটাই আবার নতুন করে সঙ্কট সৃষ্টি করলো যে!

আদিনাথ আবার বললে—তুমি তো বহুদিন আগেই কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলে—আর আমিও ব্যবসার জন্যে আসামের জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি।—তোমাদের চেয়ে মানুষ সম্বন্ধে যে আজ আমার

অনেক বেশি জ্ঞান হয়েছে এ-কথা জোর করেই বলতে পারি। মেয়ে-মানুষ সম্বন্ধে বরাবরই বেশি জ্ঞান ছিল, এবার মানুষ সম্বন্ধেও হলো। আর শুধু কি মানুষ। আগে ব্যবসা করেছি সে তো শখ করে। পকেট খরচাটা উঠলেই হলো। সেই টাকায় কখনও কাউকে শাড়ি কিনে দিয়েছি, কাউকে গয়না, কাউকে নানান উপহার! তখন বয়েস কম ছিল। দায়িত্বও ছিল কম! যা পেয়েছি, নিজের অভাবটা মিটেছে। ভেবেছি যথেষ্ট হলো। আর দরকার নেই।

কিন্তু এখন? এখন সব বদলে গিয়েছে। ব্যাণ্ডেল স্টেশনটা দিয়ে যখন ট্রেনে চড়ে যাই, দূরে সেই বড় অশথ গাছটার দিকে চেয়ে দেখি। গাছটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধ হয়ে কত কী বদলে গেল। ঘোড়ার গাড়িগুলো আছে, কিন্তু বড় জোর একটা কি দুটো! এখন সেখানে সাইকেল-রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকে দলে-দলে। সে চেহারাই নেই! কিম্বা হয়তো হতে পারে আমার সে-চোখই বদলে গিয়েছে।

সুকুমারী এখন ছেলেমেয়েদের মানুষ করতেই হিম্‌-শিম্‌ খেয়ে যায়।

সুকুমারী বলে—কমলাদির আর খবর কিছু জানো!

সত্যিই আমরা সবাই ভুলে গিয়েছিলাম কমলা দত্তর কথা। হয়তো ব্যাণ্ডেল স্টেশনের সেই ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরাও আর কমলা দত্তকে দেখতে পায় না। সেখানে সেই হুগলী গার্লস ইস্কুল হয়তো শুধু কলেজই হয়েছিল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু য়ুনিভার্সিটিও হয়নি, কিছুই হয়নি। কিন্তু সুকুমারী আজো মনে রেখেছে তার কমলাদিকে। কমলা দত্তকে। অমন শ্রদ্ধা আর কারো শুনিনি সুকুমারীর মুখে।

সুকুমারীর সত্যিই আজো মনে আছে সে-সব কথা।

সেক্রেটারির বাড়ি থেকে আর সোজা বোর্ডিং-এ ফিরলো না সুকুমারী। গাড়োয়ানকে গাড়ি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে বললে। পর্তুগীজ-চার্চের সামনে যেতেই সেই মাস্তুলটা নজরে পড়লো। সেইদিকেই একদৃষ্টে চেয়ে রইল সুকুমারী। গাড়ি আস্তে-আস্তে চলেছে। মাস্তুলটার দিকে চেয়ে চেয়ে সুকুমারী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

একদিন আদিনাথের কাছেই ওরই মাস্তুলের গল্প শুনেছিল সুকুমারী।

সে অনেক কাল আগের কথা। ১৬৩১ সালের অক্টোবর মাস। সম্রাট সা'জাহান তখন ভারি রেগে গিয়েছেন পর্তুগীজদের ওপর। খাজনা দেয় না নিয়ম করে। প্রজাদের ধরে-ধরে খ্রীস্টান করে, চাষীদের ধরে-ধরে চুরি করে নিয়ে যায়। কাশিম খাঁকে পাঠালেন সা'জাহান পর্তুগীজদের জব্দ করতে। কাশিম খাঁ এসে সাড়ে তিনমাস ধরে যুদ্ধ চালালো। একেবারে ধূলিসাৎ করে দিলে শহর। কত লোক ধরে নিয়ে গেল আগ্রাতে তার ঠিক নেই।

কিন্তু অতো যে কাণ্ড তারপরেও যে পর্তুগীজরা আবার জমি পেলো, জমিদারী পেলো সম্রাটের কাছ থেকে—তা শুধু ওই একজনের জন্যে। সে পাদরী দা-ক্রুজ্।

লোকে বলতো—পাদরী সাহেব আমাদের সাক্ষাৎ অবতার গো—

এদিকে কাশিম খাঁ'র জ্বালায় তখন গীর্জে-টীর্জে সব ভেঙে একেবারে মাটি সমান হয়ে গিয়েছে। গীর্জার ভেতরে ছিল ভার্জিন মেরীর এক পাথরের মূর্তি। ভার্জিন মেরীকে লোকে বলতো—গুরু-মা। সেই গুরু-মাকে কোলে নিয়েই গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাদরী সাহেবের এক সওদাগর বন্ধু। কিন্তু শেষে হঠাৎ দা-ক্রুজ্ সাহেবকে পাওয়া গেল। তাঁকেই ধরে আনা হলো মাঠের ওপর। হুকুম হলো পাগলা হাতী দিয়ে পায়ের চাপে পিষে মারতে হবে সাহেবকে। সাহেব অনেক লোক খ্রীস্টান করেছে।

পাগলা হাতীও এল একটা। কিন্তু পাদরী সাহেবকে দেখে তার কী মতিচ্ছন্ন হলো কে জানে—পাদরী সাহেবকে কিছুই করলে না। শুধু সামনে হাঁটু-গেড়ে দাঁড়িয়ে শুঁড়টা সাহেবের মাথার ওপর বুলোতে লাগলো।

অবাক কাণ্ড! এমন কাণ্ড কেউ দেখেনি কোথাও!

লোকে বলতো—পাদরী সাহেব আমাদের সাক্ষাৎ অবতার—

তা অবতারই সত্যি! হরিবোল দিয়ে উঠলো সবাই, যে যেখানে ছিল। দ্বিতীয় প্রহ্লাদ অবতারই বটে!

কাণ্ড দেখে বাদশা'র লোকেরও চক্ষুস্থির। তারা সাহেবকে ছেড়ে

দিলে। শুধু তাই নয়। আবার গীর্জার জন্যে নিষ্কর জমিও দিলে। আবার গীর্জা হলো। কিন্তু গুরু-মা কোথায় ?

গুরু-মা এল পরদিন। হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো আগের দিন রাত্রে। আকাশ ভেঙে বাজ পড়লো, গঙ্গার জল উথলে উঠলো। সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই আগুনের আলো হয়ে গেল গঙ্গার বুকটা। সবাই অবাক হয়ে দেখলে গঙ্গার ভেতর থেকে পাদরী সাহেব গুরু-মাকে নিয়ে উঠে আসছে।

সেই থেকে গুরু-মা'র ভারি নাম-ডাক। গুরু-মা'র নামে মানত করলে সন্তানহীনের সন্তান হয়, মুমূর্ষু রোগী সেরে ওঠে, হারানো ছেলে ঘরে ফিরে আসে।

তার কয়েকদিন পরেই মাঝ-সমুদ্রে একদিন বুঝি খুব ঝড় উঠেছিল। জাহাজ-টাহাজ আর চলে না। প্রায় ডোবে-ডোবে অবস্থা। এক জাহাজের কাপ্তেন মানত করলে জাহাজ যদি ব্যাণ্ডেলের ঘাটে ভালোয়-ভালোয় পৌঁছোতে পারে তো গুরু-মাকে পুজো দেবে মনের মতন করে।

তা সেই ঝড় থামলো। জাহাজও এসে পৌঁছলো ব্যাণ্ডেলের ঘাটে। কিন্তু কাপ্তেন সাহেব আর কী দিয়ে পুজো দেবে! তাই ঘাড়ে করে মাস্তুলটাই নিয়ে এল গীর্জায়!

এ সেই মাস্তুল।

ঘোড়ার গাড়ি মাস্তুল ছাড়িয়ে ডান দিকে চললো।

অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়তে লাগলো সুকুমারীর।

যেদিন সামার ভেকেশনের আগে সুকুমারীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছিলো, আদিনাথ বলেছিল—এখন এক মাসের জন্যে আর ব্যাণ্ডেলে আসা আমার বন্ধ—

সুকুমারী বলেছিল—কমলাদি কিন্তু ছুটির মধ্যেও একদিন আসতে বলেছিলো জানো—সবাই তো চলে যাবে, একলা থাকতে কষ্ট হবে বৈকি। তা আসবে একদিন ?

আদিনাথ বলেছিল—তুমি নেই, আমি আর কষ্ট করে আসতে পারবো না—

সুকুমারী বলেছিল—এলে কমলাদি কিন্তু খুব খুশি হতো—সত্যি—

আদিনাথ বলেছিল—তোমার কমলাদিকে খুশি করার জন্যে আমার তো ভারি মাথা-ব্যথা—

তারপর সুকুমারী ছুটির মধ্যেও একদিন বলেছিল—শনিবার-শনিবার কোথায় যাও তুমি—বলো তো ?

আদিনাথ হেসে বলেছিল—তোমার কমলাদির কাছে।

সেদিন কিন্তু কথাটা হেসে উড়িয়েই দিয়েছিল সুকুমারী। ভেবেছিল আদিনাথ বুঝি নিছক রসিকতাই করছে।

বলেছিল—কমলাদি'র কাছে তোমার আর যেতে হয় না—কমলাদিকে তেমন মেয়ে পাওনি—

আদিনাথ বলেছিল—কেন, তোমাদের কমলাদি কি বাঘ নাকি ?

—বাঘের চেয়েও বেশি, গেলে তোমার সঙ্গে দেখাই কববে না বলে দিচ্ছি—তাড়িয়ে দেবে দেখো—

আদিনাথ বলেছিল—সে-ও তো এক রকমের অভিজ্ঞতা—জীবনে কোনও মেয়ের কাছেই হারিনি, দেখাই যাক না, হারতে কী রকম লাগে—

সুকুমারী বলেছিল—হারতে তোমার খুব সাধ, না গো ? কিন্তু কমলাদিকে তুমি এখনও চেনোনি—আমরা এতদিন মিশছি তাই-ই বলে চিনতে পারলুম না। একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকি তবু পায়ের গোড়ালি কখনও দেখতে পেলুম না। কোনদিনও এতটুকু দুর্বলতা দেখতে পেলুম না কমলাদি'র—কমলাদি'র সঙ্গে ভাব করতে চেষ্টা করো না—

আজ একলা গাড়ির ভেতর বসে-বসে সুকুমারী প্রায় কেঁদেই ফেলবার যোগাড়। এমন করে কমলাদি তার সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত শ্রদ্ধা পায়ে মাড়িয়ে ধুলো করে দেবে কে জানতো! আর যারই সঙ্গে পারুক কমলাদির সঙ্গে প্রতিযোগীতায় তো সে পারবে না।

সেক্রেটারী বলছিলেন—শনিবার-শনিবার কি তুকি কলকাতায় বেড়াতে যাও ?

—প্রতি শনিবার কেউ তোমায় দুপুর বেলা নিতে আসেন ?

—তাঁর সঙ্গেই কি তোমার বিয়ে হবে শেষ পর্যন্ত ?

একলা মুখোমুখি বসে সেক্রেটারির সঙ্গে এই তার প্রথম কথা কওয়া বলা যেতে পারে। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে সুকুমারী শুধুই 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' বলে যাচ্ছিলো।

তারপর সেক্রেটারী বললেন—তুমি কি নিজের মঙ্গল চাও ?

সুকুমারী এবারও বললে—হ্যাঁ—

সেক্রেটারী বললেন—তা হলে তুমি কি জানো, সামার ভেকেশনের ছুটির সময় যখন তুমি ছিলে না, তখনও তিনি শনিবার-শনিবার আসতেন, কমলা দত্তর সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে বেরোতেন ?

পোস্টাপিসের সামনে গাড়িটা আসতেই সুকুমারী চিৎকার করে উঠলো—থামো, থামো এখানে—

গাড়ি আসতেই সুকুমারী নেমে পোস্টাপিসের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

তারপর ভিতরে গিয়ে বললে—একটা টেলিগ্রামের ফর্ম দেখি—

আদিনাথ বললে—সেই টেলিগ্রাম আমি পেলাম সন্ধ্যে-বেলা। পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আবার কী দুর্ঘটনা ঘটলো কে জানে। রাতে যাবার আর গাড়ি নেই। থাকলেও ফিরবো কিসে ? গেলাম ভোরবেলার ট্রেনে। গিয়ে দেখি প্ল্যাটফরমের ওপর সুকুমারী একলা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

সুকুমারী বললে—চলো, এখুনি চলো—

—কোথায় ?

আদিনাথের মনে হলো সুকুমারীর যেন জোরে-জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। যেন সারারাত ঘুমোয়নি সে।

আদিনাথ আর একবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছো তুমি ?

সুকুমারী সে-কথার উত্তর দিলে না। শুধু বললে—আমি আর একদিনও দেরি করবো না—এক দণ্ডও আর অপেক্ষা করা চলে না আমার—

তারপর গাড়ি করে গেলাম সেই পুরনো গীর্জার কাছে। সুকুমারী বললে—নামো এখানে।

—এখানে কী করতে ?

সুকুমারী এবারও কোনো উত্তর দিলে না। সোজা নিয়ে গেল সেই মাস্তুলটার কাছে। তারপর বললে—এই মাস্তুলে হাত দাও—আর সামনে ওই দেবীর দিকে মুখ করে চাও—সবাই সাক্ষী থাক, বলো...

আদিনাথ বললে—তারপর ভাই হিন্দুর ছেলে হয়ে খ্রীস্টানদের গীর্জার সেই মাস্তুল ছুঁয়ে ভার্জিন মেরীকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করলাম সুকুমারীকে বিয়ে করবো। সেই প্রতিজ্ঞা শুনে তবে সুকুমারী যেন একটু শান্ত হলো। আর তারপরেই হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললে —কমলাদিকেই জীবনে সব চেয়ে বিশ্বাস করতাম আমি, সব চেয়ে শ্রদ্ধা করতাম, কমলাদির কাছে কোনও কথা কখনও গোপন করতাম না— সেই কমলাদিই কি না শেষে আমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো ?

তখনও আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বললাম—কেন, কমলাদি কী করলে তোমার ?

সুকুমারী আরো কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে—গরমের ছুটিতে তুমি আসোনি এখানে ? কমলাদিকে নিয়ে গাড়ি চড়ে বেড়াতে যাওনি বলতে চাও ?

আদিনাথ থামলো। বললে—বুঝলাম এ-কথা প্রচার হয়েছে আর যার কাছ থেকেই হোক কমলা দত্তর কাছ থেকে নয় নিশ্চয়ই।

তারপর বললে—যা হোক, এ-কাহিনী সুকুমারীর। সুতরাং এ প্রসঙ্গ সংক্ষেপেই সারবো। সুকুমারী শুধু এইটুকুতেই ক্ষান্ত হলো না। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে একদিন মা-কালীর মাথায় হাত দিয়েও প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছাড়লো যে, তাকেই বিয়ে করতে হবে। অবশ্য আমার কাছে এ প্রতিজ্ঞা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে, একে অবজ্ঞা করলে মহাপাতক হতে হবে। কিন্তু তারপর যে-কাণ্ডটি করলো সুকুমারী সেইটিই ভীষণ ! এবং তার জন্যেও দায়ী আর কেউই নয়—দায়ী একমাত্র কমলা দত্তই।

সুকুমারী বললে—সংসারে সত্যিই আর কাউকেই বিশ্বাস নেই দেখছি।

কমলা দত্ত এ-সবের কিছুই জানতো না। বলতো—কেন, আমার

ওপর কেন রাগ করিস তুই সুকুমারী মিছিমিছি—

সুকুমারী বলতো—তোমার মতো বিশ্বাস আমি আর কাউকে করিনি যে—

কমল দত্ত হাসতো। বলতো—বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কী করেছি খুলে বল তো?

শুধু কমলা দত্ত নয়! সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে সুকুমারীর পরিবর্তন দেখে। এমন তো ছিল না। কথায়-কথায় খিট্‌খিটে ভাব। অকারণে ঝগড়া বাধায় কমলাদির সঙ্গে।

কমলাদি বলে—তোর ক্লাশে আজ মেয়েরা অতো গোলমাল করছিল কেন রে সুকুমারী?

সুকুমারী বলে—ছোট ছেলে-মেয়েরা একটু গোলমাল করেই থাকে—

—তা বলে চুপ করাতে পারিস না। অন্য ক্লাশের মেয়েদের যে পড়াশোনার ক্ষতি হয়—

—হোক, তা বলে তোমার মতো গোমড়ামুখী কেউ তো নয়।

শনিবার রাত্রে হেস্টেলে ফিরে এলেই কমলা দত্ত যথারীতি প্রশ্ন করে —আজ কোথায় গিয়েছিলি রে তোরা সুকুমারী—

সুকুমারী আজকাল ঝাঁজিয়ে ওঠে—তোমার তো হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে কমলাদি—তুমি কথা বলতে আসো কোন্ মুখে?

কমলা দত্ত অবাক হয়ে যায়। বলে—হিংসে! হিংসে হবে কেন রে? তুই যে অবাক করলি আমাকে সুকুমারী!

শুধু খিট্‌খিটে স্বভাবই নয়। চেহারাও যেন কেমন বদলে গিয়েছে সুকুমারীর। খায় না পেট ভরে! খেতে পারে না। খেতে বসেই উঠে যায়। বলে—ভালো লাগছে না আর খেতে—

তারপর হঠাৎ বাথ-রুম থেকে হড়-হড় করে শব্দ আসে।

কমলা দত্ত বলে—বাথ-রুমে এত ভাত পড়ে কেন রে?

মনীষা সেন বলে—কাল যে সুকুমারী বমি করেছে জানো না কমলাদি?

এমন ঘটনা কমলা দত্তর অজানা নয়। সেক্রেটারির বাড়িতে মানু,

ভান্থু, সান্থু, আহ্লাদীমাসীমা সকলেরই দেখেছে। আঁতুড়-ঘর বছরে একদিনের জন্যেও খালি পড়ে থাকে না সেখানে। কমলা দত্ত লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য করে সুকুমারীর চোখের নিচে যেন কালি পড়েছে। কেমন যেন সন্দেহ হয়।

মেজদিদিমার কথাটা মনে পড়লো—কুলাচার না হলে কি সিদ্ধি হয় মা—মহামায়ার দূতী ব্রজে এসে রাধা-নাম নিলে আর কিষ্ট মথুরায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে কুলাচার করলেন—তবেই তো তাঁর সিদ্ধি হলো—! আর আমার যেমন কপাল মা, পরের আঁতুড় তুলতে-তুলতেই জীবন কেটে গেল!

সেদিন সেক্রেটারি দরখাস্তের নাম শুনেই চটে উঠলেন।

—না না. এখন কারো ছুটি হবে না, সামনে য়্যানুয়েল পরীক্ষা, তারপর ক্লাশের কোর্স এখনও শেষ হলো না—

কমলা দত্ত বললে—ছুটি তো পাওনাও হয়েছে এর—আর তা ছাড়া এক মাস পরেই ফিরে আসবে ঠিক কথা দিয়েছে আমায়—

সেক্রেটারি বললেন—ছুটি পাওনা থাক আর না-ই থাক, এখন ছুটি দেওয়া চলবে না—

কমলা দত্ত বললে—কিন্তু এর যে শরীরও খারাপ হয়েছে—

সেক্রেটারি এবার কৌতূহলী হলেন। বললেন—শরীর খারাপ? কার? টীচারের নাম কী?

কমলা দত্ত বললে—সুকুমারী। সুকুমারী বসু, বাংলার টীচার—

নামটা শুনেই কিন্তু সেক্রেটারি কেমন যেন হঠাৎ বড় দয়ালু হয়ে উঠলেন। বললেন—সুকুমারী বসুর? তা আগে বলোনি কেন? এক মাসে যদি না সারে তো দু'মাসেরই না-হয় নিক—

বলে ঝট্-ঝট্ করে সই করে দিলেন, এক মিনিটও দ্বিধা করলেন না। কমলা দত্ত কেমন যেন অবাক হয়ে গেল দেখে।

ইস্কুলেরও এখন অনেক কাজ বেড়েছে। চারদিকে মিস্ত্রি-মজুর খাটছে।

ইট-চুন-সুরকির পাহাড়। বাঁশের ভারা বেয়ে-বেয়ে মজুররা মাথায় করে ইট বয়ে নিয়ে যায়। খোয়া ভাঙার শব্দে কান পাতা যায় না। তবু কমলা দত্তর কোনও বিরক্তি নেই। মিস্ত্রিরা যখন চলে যায় কাজের শেষে, কমলা দত্ত গিয়ে দাঁড়ায়। বাড়িটা সম্পূর্ণ হলে কেমন দেখাবে কল্পনা করে নেবার চেষ্টা করে।

আহ্লাদীমাসীমার ছেলে হয়েছে আর মানুর মেয়ে। মা আর মেয়ে বসে-বসে চা খায় আর সামনে আকাশের দিকে পা ছুঁড়ে খেলা করে দু' মাস বয়সের মামা-ভাগ্নি।

আহ্লাদীমাসীমা বলেন—এবার কমলা মেয়েরও ছেলে হবে—

কমলা দত্তর কান দুটো লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। শুধু বলে—ছিঃ, কী যে বলো মাসীমা—

আহ্লাদীমাসীমা বলেন—তা ইস্কুল-কলেজই তো তোর সব মা, সোয়ামী পুত্, যা কিছু বলিস সবই তো তোর ওই ইস্কুল—

কমলা দত্তর এক-একবার মনে হয় পুরনো গীর্জার সেই সিঁড়িটা বেয়ে চাতালে গিয়ে দেখে আসে। সে-লেখাটা কি এখনও তেমনি আছে! এত বর্ষা-রোদ আর ঠাণ্ডার পরেও! কিন্তু সময় হয় না। কাজ কি তার কম!

শনিবার দিন আদিনাথ আবার এল। ট্রেন লেট ছিল, আসতে একটু দেরিই হয়েছিল।

কমলা দত্ত বললে—এত দেরি করে এলেন, সুকুমারী আপনার জন্যে সকাল থেকে সেজে-গুজে বসে আছে যে—

বলে সুকুমারীকে ডাকতে পাঠালে।

আর কিছু কথা বলবার ছিল না।

তবু আদিনাথ একবার বললে—এবার ব্যাণ্ডেলে আসবার আর কোন্ উপলক্ষ্য খুঁজবো তাই ভাবছি—

কমলা দত্ত মুখ নিচু করে কাজ করতে-করতেই বললে—এবার উপলক্ষ্য খুঁজলেও আর পাবেন না হয়তো—আর তা ছাড়া এখানে আসবার প্রয়োজনও হয়তো হবে না আপনার—

আদিনাথ কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ সুকুমারী সঙ্গে মোট-ঘাট নিয়ে এসে হাজির। এসেই আদিনাথকে বললে—চলো তাহলে—

কমলা দত্ত আদিনাথকে বললে—একমাস পরে সুকুমারীকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন তো—?

উত্তর দিলে সুকুমারী। বললে—আশীর্বাদ করো কমলাদি আর যেন তোমার কাছে কখনও না ফিরে আসতে হয়—আর যেন এমন করে মুখ না পোড়াতে হয়!

হঠাৎ চমকে উঠলো যেন আদিনাথ। কমলা দত্ত কিন্তু উত্তর দিলে না। প্রশান্ত হাসিতে সমস্ত সহ্য করাই যেন তার কাজ।

বাইরে গিয়েও ফিরে এল আদিনাথ। হাত জোড় করে বললে—ওর হয়ে আমিই আজ আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি কমলা দেবী—আপনি কিছু মনে করবেন না যেন—

বললাম—তারপর?

আদিনাথ বললে—তারপর দু'জনে কলকাতায় চলে এলাম আর তার কয়েকদিন পরেই তাড়াতাড়ি বিয়েটা আমাদের সারতে হলো। এত শীগগির বিয়েটা হয়তো হতো না। কিন্তু কমলা দত্তর জন্যেই যে সুকুমারী এই চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়েছিল তাও জানি। আর আমার এক মুহূর্তের অসাবধানতাতেই যে এইটে ঘটলো তাও স্বীকার করি। তা হোক—সমস্ত অঘটনের জন্যে তখন আমি প্রস্তুতই ছিলাম! বাড়ি থেকেও আলাদা হয়ে গেলাম একদিন—কিন্তু সে তো অন্য গল্প। কমলা দত্তকে নিয়ে যে-গল্প সেইটেই বলি এবার।

বিয়েতে নেমন্তন্ন করবার প্রসঙ্গ উঠতেই সুকুমারী বললে—কমলাদিকেই প্রথমে নেমন্তন্ন করতে হবে কিন্তু—বুঝেছো, ওকেই আগে চিঠি পাঠাও—

নতুন বাসাবাড়িতে ছোট উৎসবের একটা আয়োজনও করতে হয়ে-

ছিল।

মনীষাদি, মীরাদি, মাধুরীদি, ইলাদি, মায়াদি, শিখাদি সবাই এসে-ছিল সেদিন। আসেনি শুধু কমলা দত্ত।

সুকুমারী জিজ্ঞেস করলে—কমলাদি এল না ?

মনীষাদি বললে—কেন, কমলাদির যে অসুখ, শুনিসনি তুই ?

অসুখ! আমিও অবাক হয়ে গেলাম। কমলা দত্তর অসুখ হয়েছে জানতাম না তো। লৌকিকতা হিসেবে নিজের একজোড়া বালা পাঠিয়ে দিয়েছে কমলা দত্ত। সেই চেনা পুরনো বালা-জোড়া। মাঝে-মাঝে কোনোদিন ইচ্ছে হলে বাক্স থেকে সে-হুটো বার করে পরতো। কমলাদি না আসাতে সুকুমারীর অর্ধেক আনন্দই যেন নিবে এল। সুকুমারী জিজ্ঞেস করলে—ইস্কুলের আর কী খবর মনীষাদি ?

খবর! খবর আর কী! সেই রকমই চলছে। কলেজের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ইট-চুন-সুরকির পাহাড় চারিদিকে। মিস্ত্রি-মজুর খাটছে।

কমলা দত্ত চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকে। নিজে উঠতে পারে না তো। তবু শুয়ে-শুয়েই বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করে। ডাক্তার-নার্স আসছে। সেক্রেটারি এসে দেখে যান। একমাস ধরে চিকিৎসায় অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল সেক্রেটারির—

—কিন্তু কী করে কমলাদির অসুখ হলো এমন ?

সে-কথাও বললে ওরা। একদিন ইস্কুলের ছুটির পর গাড়ি করে বেরিয়েছিল কমলা দত্ত। এমন প্রায়ই তো যেতো। সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু ফিরে আসে না কমলাদি। রাত্তির হলো তবু আসে না। ভেবে-ভেবে অস্থির সবাই। সেক্রেটারির বাড়িতে কমলাদি যায় বটে মাঝে-মাঝে। এক-একদিন ওখান থেকেই চা-টা খেয়ে আসে। তারপর হয়তো গল্প করে আহ্লাদীমাসীমার সঙ্গে। তারপর এক-একদিন কাজ থাকলে ফিরতে সাতটা সাড়ে-সাতটাও বেজে যায়। কোনও ঠিক নেই।

মনীষাদি বলে—সেক্রেটারির বাড়িতে খবর পাঠাবো ভাই ? বড় যে ভয় হচ্ছে—

কালোর-মা রাত্তির আটটা নাগাদ দৌড়োতে দৌড়োতে এল।

বললে—বড়দিদিমণি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে গো দিদিমণি, শুনেছো?

—কোথায়?

—সেক্রেটারির বাড়িতে।

—কী হয়েছিল?

—কী হয়েছিল কেউই জানে না। সেক্রেটারিও না। কালোর-মাও নয়।

আহ্লাদীমাসীমার কাছেও খবরটা গেল। শুনে তাঁর হাত-পা বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে এল যেন। বললেন—হ্যাঁ গা, জলজ্যান্ত মেয়েটা এমন পড়ে গেল—কেউ দেখতেও পেলে না গা? মুখে একটু জল পর্যন্ত দেয়নি কেউ? ঝড় নেই, জল নেই, পেছল নেই—মিছিমিছি এমন পড়লোই বা কেন জোয়ান মেয়েটা?

মান্থ বলে—তা বলে কমলাদি গীর্জের ধারেই বা গিয়েছিল কী করতে মা? ও-যে গোরস্থান—

মেজদিদিমা ডালে কাঠি দিতে-দিতে বলে—আমার যেমন কুলাচার হয়নি—কমলা মেয়েরও হয়নি—কুলাচার না হলে কি সিদ্ধি হয় মা—। আমি যেমন পরের আঁতুড় তুলছি—ও-ও তেমনি ইস্কুল নিয়েই গেল—

সেক্রেটারির ঘরে তখন গীর্জার বুড়ো পাদরী সাহেবও দাঁড়িয়ে ছিল। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানও দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে।

সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করলেন—তারপর? কেন এমন হলো?

গাড়োয়ান বললে—বড়দিদিমণি গাড়িতে চড়ে গীর্জের বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলেন—একঘণ্টা ধরে আসছেন না দেখে আমি বাইরে গাড়ি রেখে সাহেবকে গিয়ে তখন খবর দিলাম হুজুর—

শেষটা পাদরী সাহেবই বুঝিয়ে দিলে। বললে—কোথাও পেলুম না খুঁজে-খুঁজে। শেষে গার্ডেন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরে গিয়েই দেখি ল্যাণ্ডিং-গ্রাউণ্ডের ওপর আন্‌কনশাস হয়ে পড়ে আছে এক লেডি—দেখেই চিনতে পারলাম—আমাদের হেড মিস্ট্রেস—মিস ডাট্—

সেক্রেটারিও অবাক হয়ে গেলেন। ওখানেই বা উঠতে গেল কেন কমলা! ওখানে ওর কীসের কাজ!

কিন্তু কে আর তখন সে কথার উত্তর দেবে !

তারপর তিনদিন ওমনি অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল কমলা দত্ত। সেক্রেটারির ছেলে-মেয়েরা দিন-রাত ধরে সেবা করে। ভানু, মানু, পানুর বরেরাও এল। কমলা দত্তর বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড দেখে গেল তারা।

ভানুর বর বললে—সত্যি, কমলাদি ইস্কুলের জন্যে ভেবে-ভেবেই প্রাণটা দিলেন—

মানুর বর বললে—বাড়িতে চোখের সামনে এমন একজন উদাহরণ থাকতেও তোমরা কেউ লেখাপড়া শিখলে না আশ্চর্য—

মানু বলে—বাবা কি আমাদের পড়িয়েছে কখনও যে লেখাপড়া করবো আমরা ?

বর বলে—যার হবে, তাকেই বাবা পড়িয়েছেন—তাই কমলাদির জন্যেই টাকা খরচ করেছেন—

মানু বলে—আমরাও কি পড়তাম না নাকি, বাবা যে আমাদের সাত-তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন আর বিয়ে হতে-না-হতেই আমরা সব আঁতুড়-ঘরে গিয়ে ঢুকলুম—

পানুদি বললে—বাবা যে আমাদের চেয়ে কমলাদিকেই বেশি ভালোবাসেন—

আহ্লাদীমাসীমা বললেন—তুই আর বকিসনি লো, তোর বিয়েতে কত খরচ হয়েছিল মনে নেই ? শুধু দান সামগ্রীই তো তেরো হাজার টাকার—কোন্ মেয়েকে কমটা দিয়েছি শুনি—কোনও জামাই বলতে পারে তাকে কম দিয়েছি ! ওর ইস্কুলটাই কেবল তোদের চোখে পড়লো লো ?

তারপর কমলার কানের কাছে মুখ এনে আহ্লাদীমাসীমা বললেন—এখন কেমন আছিস রে কমলা মেয়ে ?

বলে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলেন না তিনি। বললেন—যাই আবার একটু গড়িয়ে নিগে যাই—খেয়ে উঠে আর এক মিনিট দাঁড়াতে পারিনে মা—কী গতর যে হয়েছে—

তিনদিন পরে একটু জ্ঞান হলো যেন। তারপর ভালো করে চারদিকে চেয়ে দেখলে কমলা দত্ত।

বিকেলবেলা কমলা দত্ত বললে—আমি ইস্কুলে যাবো মাসীমা—

আহ্লাদীমাসীমা গালে হাত দিলেন।

—ইস্কুলের আর এখন নাম করো না মা, গায়ে একটু বল হোক আগে—তারপর যেও—

কমলা দত্ত মুখে কিছু বললে না। কিন্তু ইস্কুলে তখনও তার অনেক কাজ পড়ে আছে। আস্তে-আস্তে সমস্ত ঘটনাটা তার মনে পড়তে লাগলো। সেক্রেটারির ছোট ছেলে পরে একদিন বলছিল—সেদিন কী ভিড় কমলাদি গীর্জার ধারে। ব্যাণ্ডেলের সব লোক গিয়ে হাজির ওখানে—। সবাই জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে গো এখানে? আমি যখন খবর পেয়ে গেলাম, তখন ভেতরে ঢুকতে পারি না, এত ভিড়!

ইস্কুলে আসবার দিন আহ্লাদীমাসীমা বলেছিলেন—এখন আর বেশি কাজ করো না মা, দিনকতক জিরিও—নইলে কোনদিন আবার কোথায় মাথা ঘুরে পড়ে থাকবে—কেউ দেখতেই পাবে না—তা হলেই চিত্তির—

তারপর আবার যেমন চলতো ইস্কুল, তেমনি চলতে লাগলো। কলেজ হলো। নতুন বাড়ি হলো। সেক্রেটারি আরো টাকা ঢাললেন। ইস্কুলের নাম আরো বাড়লো। নতুন-নতুন টীচার এল! সুকুমারী চলে গিয়েছে বটে, কিন্তু তার জায়গায় এল বাসন্তী। শিখাদি এ-ইস্কুল ছেড়ে আসানসোলে বেশি মাইনের চাকরিতে চলে গেল। ইলা দত্তর মা মারা গিয়েছে। মাধুরীর দাদার বিয়ে হলো। মান্তুর আবার একটা মেয়ে হলো, সান্তুর বিয়ে হলো কলকাতায়, পান্তুদির বর পাটনায় বদলি হয়ে গেল—। আহ্লাদীমাসীমা আরো মোটা হলেন। এবার তাঁরও ছেলে হবে আবার।

এমনি কত খবর!

ইস্কুলে ফিরে আসবার পর মনীষা সেদিনও জিজ্ঞেস করেছিল—কমলাদি সত্যি বলো তো, ওখানে উঠতে গেলে কেন? ওই চাতালের

ওপর ?

সুকুমারীও জিজ্ঞেস করলে—তা এত জায়গা থাকতে সত্যি ওখানেই বা উঠতে গেল কেন কমলাদি ?

মনীষা সেন বললে—কে জানে ভাই—কী মনে করে গিয়েছিল। সে-কথা কাউকেই বলে না! কতদিন জিজ্ঞেস করেছি—কিছুতেই ভাঙে না কমলাদি—

কিন্তু কমলাদি না প্রকাশ করুক—প্রকাশ একদিন হয়ে গেল।

তখন কলেজ হয়েছে হুগলী গার্লস স্কুল। সেই কলেজের লেডী প্রিন্সিপ্যাল কমলা দত্ত। সমস্তদিন কাজের আর সীমা-পরিধি নেই। আজ ইস্কুল কমিটীর মিটিং, কাল কলেজের এডুকেশন কমিটীর ইলেকশন। ভোট আর ষড়যন্ত্র, ফাইল আর পরীক্ষা এই সব নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। আরো ঘন ঘন যেতে হয় সেক্রেটারির বাড়ি।

সেক্রেটারির বাড়িতেও আরো পরিবর্তন হয়েছে।

আহ্লাদীমাসীমা এদানি আরো মোটা হয়েছে। বেশি কথা বললে বুকে হাঁফ ধরে। গায়ে জামা রাখতে পারে না, কাপড় রাখতে পারে না। বলে—জামা পরলে গতর আই-ঢাই করে মা—

তারপর কমলা দত্তকে দেখে বলে—গতর বটে তোর—কেমন করে রাখলি মা তোর গতর—

তা সত্যিই শরীর বটে কমলা দত্তর। কোথাও টোল্ খায়নি। কোথাও ঢল নামেনি।

সেই নিটোল শরীরটা যেন সেদিন প্রথম দেখলেন সেক্রেটারি।

কমলা দত্ত ফাইল-পত্র নিয়ে কাজ দেখিয়ে নিতে এসেছিল।

সেক্রেটারি বললেন—শুনলাম, সদয়বাবু নাকি ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন ?

কমলা দত্ত বললে—আমিও শুনেছি—

সেক্রেটারি বললেন—উনি যাতে কোনও গার্জেনের ভোট না পান তার ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে!

কমলা দত্ত কিছু বললে না।

সেক্রেটারি আরো বললেন—আমার বাছাই করা লোক ছাড়া আমি

কমিটীতে কাউকে রাখবো না—তো তোমায় আমি বলে রাখছি—

তবু কমলা দত্তর মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরুলো না। তারপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে আসতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন একটু দ্বিধা করলো।

সেক্রেটারি বললেন—আর কিছু বলবে?

কমলা দত্ত এবার মুখ তুলে চাইলে। সোজা নিষ্পলক, নির্ভীক দৃষ্টি। সেক্রেটারি যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। এমন করে তো কোনওদিন কমলা দত্ত চায় না। সেক্রেটারির নজরে পড়লো কমলা দত্তর শরীরটা। নিটোল, নিভাঁজ, নির্ভীক!

হয়তো বলতে গেলেন কিছু কথা। কিন্তু তার আগে কমলা দত্তই কথা বলেছে।

কমলা দত্ত বললে—আমি ছুটি চাই—

—ছুটি!

নিজের কান দিয়ে সেক্রেটারি যেন আর একবার শুনতে চাইলেন কথাটা।

—হ্যাঁ, কিছুদিনের ছুটি!

সেক্রেটারি তবু বিশ্বাস করতে পারলেন না। ঠিক শুনেছেন তো তিনি!

বললেন—তোমার নিজের ছুটি না আর কারো?

—না, আমারই ছুটি!

—ছুটি নিয়ে তুমি কোথায় যাবে?

কমলা দত্ত বললে—যাবার জায়গা আমার আছে।

সেক্রেটারি গম্ভীর হয়ে গেলেন—। বললেন—বাঘ-নিসুন্দিপুরে? সেখানে তোমার মা তো মারা গিয়েছেন—আর বাবা, তাঁর তো কোনও সংবাদই নেই—

কমলা দত্ত বললে—না, বাঘ-নিসুন্দিপুর ছাড়াও আমার যাবার জায়গা আছে—

—কোথায়?

কমলা দত্ত কোনও উত্তর করলে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সেক্রেটারি বললেন—বোসো কমলা, তোমার মাথার ঠিক নেই—স্থির হয়ে বোসো—

কমলা দত্ত চেয়ারের ওপর বসলো।

সেক্রেটারি প্রথমে নরম হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—সামনে ইলেকশন আসছে—এ-সময়ে তোমাকে ছুটি কী করে দেওয়া যায় বলো? তোমার ওপরেই যে সমস্ত ভার—তুমি বোঝো না?

কমলা দত্ত বললে—আমি আর পারছি না—

সেক্রেটারি বললেন—আমি তো আছি, আমি তোমাকে সাহায্য করবো—যে-কাজ তুমি পারবে না, আমি করে দেবো—

কমলা দত্ত তবু চুপ করে বসে রইল।

সেক্রেটারি বললেন—বিশ্রাম তোমার দরকার বুঝতে পারি, তুমিও তো মানুষ, আর শুধু মানুষ নয়, মেয়েমানুষ। মেশিনেরও বিশ্রাম দরকার হয়—কিন্তু তা বলে এখন, এই ইলেকশনের সময়ে?

কমলা দত্ত তবুও চুপ করে রইল।

সেক্রেটারি বললেন—ছুটি যদি নিতেই হয় তো নিও—পরে নিও—কোথাও যদি চেঞ্জে যাবার দরকার হয় তো যেও—আমার সঙ্গেই যেয়ো—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো—একলা তোমায় ছেড়ে দেওয়া যায় না—

কমলা দত্ত বললে—না, আমার এখনি ছুটি চাই—

সেক্রেটারি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এত সাহস কমলা দত্ত হঠাৎ কোথায় পেলো!

বললেন—তবু তোমার ছুটি চাই?

কমলা দত্ত বললে—হ্যাঁ—

—কোথায় যাবে?

—কলকাতায়।

—কলকাতায়! কলকাতায় কোথায়?

কমলা দত্ত বললে—সুকুমারীর বাড়িতে।

—সুকুমারী কে? সুকুমারী বসু? আমাদের বাঙলার টীচার ছিল?

—হ্যাঁ, তার বিয়ের সময় যেতে পারিনি, এবার যাবোই,—তাঁরা নতুন বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন,—আমাকে যেতে লিখেছেন—

সেক্রেটারি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুলো না।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন—সব তো বুঝলাম—কিন্তু এই ইস্কুল, এই কলেজ…এ সবই তো তোমার…এইপ্রতিষ্ঠানের সব দায়িত্ব? একদিন এর উন্নতি-অবনতি লাভ-লোকসান সব তো তোমার ওপরেই নির্ভর করবে—যেদিন এ আরো অনেক বড় হবে, স্বদেশ বিদেশ থেকে নানা জ্ঞানী-গুণীরা আসবেন তখন তোমারই তো জয়-জয়কার, তোমাকেই তো সবাই সম্মান করবেন—আমি কে—আমি তো কেউই নই—

তখনও কমলা দত্ত চুপ করে রইল।

রামমোহন সেন আবার বলতে লাগলেন—আর তাই-ই যদি না হবে তো আর পাঁচজন মেয়ের মতো তোমার বিয়ে দিয়ে দিলেই পারতুম, যেমন বিয়ে দিয়েছি ভানু, পানু, মানু, সানু—সকলের,—আর সকলের মতো নুন তেল মশলার সংসার নিয়ে তুমিও জীবন কাটিয়ে দিতে—কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না—ঝামেলা ছিল না…

এবারও কোনও কথা বললে না কমলা দত্ত!

সেক্রেটারি বললেন—রাত হয়ে যাচ্ছে—এবার তুমি বাড়ি যাও কমলা—

কমলা দত্ত উঠলো। আস্তে আস্তে চলেই যাচ্ছিলো।

সেক্রেটারি বললেন—দাঁড়াও—

তারপর কাছে উঠে এসে বললেন—সোজা একবারে বাড়িতে চলে যাও—আর কোথাও যেন যেও না—বুঝলে? সোজা বাড়ি—তোমার মাথার ঠিক নেই—

তারপর বাইরে এসে গাড়োয়ানকে বলে দিলেন—বড় দিদিমণিকে সোজা ইস্কুল বাড়িতে নিয়ে যাবে—আর কোথাও যেও না—সোজা ইস্কুল বাড়ি—বুঝলে?

গাড়োয়ান সেলাম করে বললে—জী হুজুর—

তারপর কমলা দত্ত গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসে দরজা জানলা বন্ধ করে দিতে তবে যেন একটু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন রামমোহন সেন।

সেদিন শনিবার। সামার ভেকেশনের ছুটি হয়ে গিয়েছে। অনেক-দিন আগে সামার ভেকেশনের সময় এমনি একটা শনিবারের ঘটনা। সেক্রেটারি নেই। সেদিনও এমনি হয়েছিল। তখন এমন কলেজ হয়নি এ—ইস্কুল। তখন যারা ছিল এখন তাদের অনেকেই নেই। তবু সকলেই কমলাদি বলতে অজ্ঞান।

আফিস ঘরে কমলা দত্ত বসে ছিল। টীচাররা সবাই চলে গিয়েছে যে-যার বাড়ি।

হঠাৎ পিওন এসে চিঠি দিয়ে গেল। রোজকার ডাক।

আজেবাজে সব চিঠি। নানান কাজের। হঠাৎ একটা চিঠির হাতের লেখা দেখে কেমন যেন বাকরোধ হবার মতো অবস্থা হলো।

লিখেছে আদিনাথ। আদিনাথের সেজ ছেলের অন্নপ্রাশনে যাবার নেমন্তন্ন।

লিখেছে—কোনওবারই তো এলেন না, আমরা প্রত্যেকবারই আপ-নার জন্যে সাগ্রহে পথ চেয়ে থাকি—এবার নিশ্চয়ই আসবেন, আর যদি অসুবিধে থাকে তো আমি নিজে গিয়েও আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারি—

শেষে চিঠির নিচে সুকুমারী জুড়ে দিয়েছে—কমলাদি এবারও যদি না আসো তো বুঝবো তুমি আমাদের ওপর রাগ করেছো।

চিঠি পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে হলো—কে যেন পাশের দরজা থেকে উঁকি মারলে।

কমলা দত্ত ডাকলে—কে? কে গো তুমি?

একটু পরে কালোর-মা উঁকি দিলে। বললে—আমি বড়দিদিমণি—

আমি, তা উঁকি মেরে কী দেখছিস? উঁকি মেরে কী দেখবার

আছে ? আমি কি বাঘ-না-ভালুক, খেয়ে ফেলবো !

কালোর-মা থতোমতো খেয়ে গেল। বললে—আমি কিছু তো দেখিনি দিদিমণি !

দেখিনি মানে, আমি দেখলাম তুমি উঁকি দিলে, আবার না বলছো ?

কালোর-মা চুপ করে গেল। কিন্তু কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল মনটা। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় কালোর-মাকে অমনি উঁকি দিতে। যেন কিছু সন্দেহ করে। যেন পাহারা দেয়। যেন নজরবন্দী করে রাখে তাকে !

কাল সুকুমারীর ছেলের অন্নপ্রাশন। এখানকার কাউকেই নেমন্তন্ন করেনি। শুধু একলা কমলা দত্তকেই যেতে লিখেছে। কিন্তু এমন সুযোগ বুঝি আর পাওয়া যাবে না। সকাল বেলার ট্রেনে যদি চলে যায় কলকাতায়, বিকেল বেলাই ফিরে আসতে পারবে অনায়াসে।

পরদিন সকালবেলাই কালোর-মাকে ডাকলে কমলা দত্ত।

বললে—একটা চিঠি তোমাকে সেক্রেটারির বাড়ি নিয়ে যেতে হবে কালোর-মা—

—এই এত ভোরে ? কিসের চিঠি বড়দিদিমণি !

—লিখলুম, আমার শরীরটা খারাপ, আজকে আর সেক্রেটারির বাড়ি সকাল বেলা যেতে পারবো না, এই কথা—আর সকালে কিন্তু খাবো না আমি—আমি শুতে গেলাম আমার ঘরে, আমাকে বিরক্ত কোরো না যেন—

কালোর-মা চলে যেতেই কমলা দত্ত তাড়াতাড়ি করে গুছিয়ে নিলে। গুছিয়ে নেবার অবশ্য তেমন কিছু নেই। কিছু টাকা শুধু পথ-খরচ বাবদ। আর সুকুমারীর বড় আর মেজছেলের বেলাতে হাতের রুলি আর গলার হারছড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আর কিছু নেই দেবার মতো। শুধু রূপোর দশটা হোক কুড়িটা হোক টাকা দিলেই চলবে। খালি হাতে যাওয়া যায় না।

সমস্ত বোর্ডিং বাড়িটা ফাঁকা। কোথাও জনপ্রাণীর কোনও সাড়াশব্দ

নেই। শুধু বাড়ির শেষ-প্রান্তে জমাদারের ঘর। আপিসটা ভালো করে তালা লাগিয়ে দিলে। অনেক কিছু দামী দামী কাগজ-পত্র আছে ওখানে। টাইপ-রাইটিং মেশিন। স্কুল ফাণ্ডের ইম্প্রেস্টের সামান্য কিছু টাকা। আর গোটাকয়েক টেবিল চেয়ার। নিজের ঘরেই বা কী রইল কমলা দত্তর। সোনার জিনিস আর নেই। সব ফতুর। ট্রাঙ্কের মধ্যে শুধু গোটাকতক মিলের আর তাঁতের শাড়ি—সাদাসিধে! আর অন্য টীচারদের ঘরেই বা কী রইল। যার যা জিনিস-পত্র প্রায় সবই তো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। পাহারা দেবার মতো দামী জিনিস কিছুই নেই।

কিন্তু আর একটা প্রশ্ন। বাড়ি চিনে যেতে পারবে তো ঠিক। কখনও কলকাতায় যায়নি একা একা। যা দু'-একবার গিয়েছে, তাও সেক্রেটারির সঙ্গে। ঢাকা ট্যাক্সিতে করে। তারপর কাজ-কর্ম সেরে চলে এসেছে আবার সেক্রেটারির সঙ্গে।

তা হোক, তবু কী যে হলো কমলা দত্তর! নেশা করলেই বুঝি মানুষের এমন হয়। এই ছুটির নেশা, এই নিষিদ্ধ কাজের নেশা। নিষিদ্ধ কাজের বুঝি এমনি আনন্দ! সুকুমারী বুঝি এই আনন্দেই আদিনাথের সঙ্গে শনিবার-শনিবার পালিয়ে যেত। আজ যেন কমলা দত্তর রক্তের মধ্যে সুকুমারীর সেই পালাবার নেশাই উদ্দাম হয়ে উঠলো। সুকুমারীর ছোঁয়াচ লেগেছে বুঝি এতদিনে তার ওপর। এখান থেকে পালিয়ে যাবে সে। অনেক দূরে—অনেক দূরে। আর কোনদিন ফিরবে না। আর কোনওদিন ফিরবে না সে। তারপর শহরের একপ্রান্তে ছোট একটা ঘরে নির্লিপ্ত নির্বিকার নিরভিমান জীবন যাপন করবে। এতদিন মানুষের সঙ্গে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, আমিত্ব নামে যে কঠিন আবরণ সকলের কাছ থেকে তাকে আড়াল করে রেখেছিল, আমার মধ্যে অন্যের আর অন্যের মধ্যে আমার যে-ব্যবধান পর্বত-প্রমাণ হয়ে উঠেছিল—তার হয়তো শেষ হবে।

আদিনাথের কথাগুলো মনে পড়লো তার—স্ত্রী হতে চেষ্টা করুন স্বামী পাবেন, বোন হতে চেষ্টা করুন ভাই পাবেন, মা হতে চেষ্টা করুন সন্তান পাবেন—আপনি সত্যিকারের মেয়েমানুষ হোন—আর কিছু আমি চাই না—

স্কুল থেকে বেরিয়ে একলাই নিঃশব্দে হেঁটে কখন স্টেশনের পথে বেরিয়ে পড়েছে খেয়াল ছিল না। রাস্তায় তেমন লোকজন এখন নেই। কপাল পর্যন্ত ঘোমটায় ঢেকে কমলা দত্ত বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। এ ঘটনা তার নিজের কাছেই যেন অঘটন বলে মনে হলো আজ। এমন ঘটনা কেমন করে ঘটলো—তাই-ই তার কল্পনার বাইরে।

হঠাৎ তাকে দেখে সুকুমারী নিশ্চয়ই খুব চমকে উঠবে।

আদিনাথের মুখটাও মনে করবার চেষ্টা করলে একবার। ওদের বিয়ের দিনে যেতে পারেনি কমলা দত্ত। আজ সুকুমারীকে আশীর্বাদ করে আসবে। বলবে—তুই সুখী হ—

সুকুমারী হয়তো সে-দিনের কথাগুলো আজ নতুন করে মনে করিয়ে দেবে।

বলবে—তুমি তো ওর সঙ্গে মিশতে কত বারণ করতে আমাকে কমলাদি, তুমিই তো বলতে—এতে কল্যাণ নেই, এতে মঙ্গল নেই, এতে সুখ নেই—তুমিই তো কত বাধা দিয়েছো, রাগ করেছো, আজ দেখে যাও আমরা সুখী হয়েছি কত—কত মঙ্গল হয়েছে, কত কল্যাণ হয়েছে—কোনও অন্যায় হয়নি এতে আমাদের—

সুকুমারী বলবে—তোমার স্কুলে যখন চাকরি করেছি তখন স্বাস্থ্য আমার কত খারাপ ছিল, আর এই দেখো আজ বিয়ে করে আমি কেমন মোটা হয়েছি—ফরসা হয়েছি—

সুকুমারী আরো বলবে—তোমার কাছে থাকতে শুধু টীচার হয়েই ছিলাম—আর এখন এই দেখো আমি মা হয়েছি—তোমার কথা তো একটাও ফলেনি কমলাদি—তুমি আমাকে সব মিথ্যে কথা শিখিয়েছ কেবল—

তারপর সুকুমারী বলবে—এই দেখ আমার রান্নাঘর, এই দেখ আমার শোবার ঘর, এই দেখ আমার বৈঠকখানা, এই দেখ আমার পুজোর জায়গা, তুলসীতলা, আর এই দেখ এরা সব আমার ছাত্র—এই বড় ছেলে, মেজ ছেলে, সেজ ছেলে···

সব দেখে শুনে কমলা দত্ত বলবে—তোদের সুখ দেখে আমি সুখী

হয়েছি শুকুমারী—সেদিন আমারই ভুল হয়েছিল—আমি তোকে যা কিছু শিখিয়েছি সব মিথ্যে কথা—সব বাজে কথা—আমি ভুল করেছি-ছিলাম—আমার হিংসে হয়েছিল—বিশ্বাস কর তুই—

আদিনাথ হয়তো এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করবে—সেই পর্তুগীজ গীর্জাতে আর কখনও গিয়েছিলেন নাকি বেড়াতে?

কমলা দত্ত বলবে—গিয়েছিলাম—

আদিনাথ জিজ্ঞেস করবে—কী দেখলেন?

—কিছুই না।

—আপনার সেই হাতের লেখাটা নেই সেখানে?

—সেটা মুছে গিয়েছে, আর মুছে না গেলেও মুছে যাওয়াই তার উচিত ছিল। তাই নিজেই আমি একদিন সেখানে গিয়ে সেটা মুছে দিয়ে এসেছি—

—কেন?

—কেন, জিজ্ঞেস করছেন? অজ্ঞানে যা করেছি, সজ্ঞানে তা যে সহ্য হলো না!

—অজ্ঞানে যে ঠিক কাজ করেননি তাই বা কে আপনাকে বললে? নিজের মনকেই কি আপনি ঠিক মতো চেনেন?

—নিজেকে কি সবাই চিনতে পারে আদিনাথবাবু?

—পারে, পারে, অন্ততঃ চিনতে চেষ্টা করতেও পারে—কিন্তু আপনি যে চেষ্টাও করেন না। আপনি অন্ধকার ঘরের মধ্যে কালো বেরাল ধরবার চেষ্টা করলে পারবেন কেন, বলুন?

কমলা দত্ত বলবে—কিন্তু কেন এমন হলো? একি আমার জন্মলগ্নের দোষে? বাবা বলতেন…

আদিনাথ হয়তো হো হো করে হেসে উঠবে।

বলবে—আচ্ছা বলুন তো সকাল বেলা সূর্য ওঠে বলে আমাদের ঘুম ভাঙে না আমাদের ঘুম ভাঙবার সময় হয় বলে সূর্য ওঠে?

কমলা দত্ত একটা যেন উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আদিনাথ তার আগেই বলবে—উত্তরটা অত তাড়াতাড়ি দেবেন না—অত সহজ নয়

ওর উত্তর—

—সহজ নয় কেন বলছেন ?

—যদি অত সহজই হতো তা হলে আর আপনার কষ্ট কিসের—প্রকৃতির নিয়মকে তো আপনি মানেন না—নিয়মটাকেই আপনি যে ধরে নিয়েছেন বেনিয়ম ! তার গুণোগার দিতে হবে না ? প্রকৃতি তো আদিনাথ নয় যে সহজে ছাড়বে—আমি তো সেদিন গীর্জার চাতালে আপনাকে ছেড়েই দিয়েছিলাম কিন্তু সে তো তার শোধ-বোধ হিসেব-নিকেশ কড়ায় গণ্ডায় মিলিয়ে নেবেই—সে তো মেয়েমানুষ মানবে না, পুরুষ-মানুষও মানবে না—তার পাওনা মেটানো চাই-ই চাই—

—কিন্তু সেক্রেটারি যে বলেন—লাভটাই বড়, হিসেবটা কিছু নয়—লাভ যদি হয় তো হিসেবে ভুল থাকলেও ক্ষতি নেই—

আদিনাথ বলবে—লাভ হলো দোতলার বাসিন্দা। দোতলায় যেতে গেলে নিচের দরোয়ানটাকে তো ভুললে চলবে না—সেই দরোয়ানের নামই তো হিসেব—তার মানেই তো নিয়ম।

—কিসের নিয়ম ?

—এই যে আপনাকে আমার ভালো লাগে বা একদিন আমাকে আপনার ভালো লেগেছিল এই নিয়ম। সে-নিয়ম তো আপনি সেদিন মানেননি !

—কিন্তু এখনও তো সময় আছে !

—না, আর সময় নেই।

—কেন ?

—লগ্ন পার হয়ে গিয়েছে—প্রকৃতির নিয়মের মজাই যে ওই—একবার লগ্ন পার হয়ে গেলে আর সে ফিরে আসে না—

—ফিরে আসে না ? কিন্তু আমি তো ফিরে যাবো বলে আসিনি আদিনাথবাবু !

হঠাৎ যেন কী হয়ে গেল। ট্রেন আসার গোলমাল। প্ল্যাটফরমে অনেক ভিড়। টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে। এবার তাকে সতর্ক হতে হবে। ঘোমটা ঠিক করে নিয়ে কমলা দত্ত এবার প্রস্তুত হলো। সময়

আছে। এখনও সময় আছে! এখনও লগ্ন পার হয়নি!

—এই যে বড়দিদিমণি এইখানে!

—এ কি কালোর-মা! তুমি এখানে! তোমাকে তো খবর দিইনি! তোমাকে তো জানাইনি!

কিন্তু হঠাৎ সামনেই এগিয়ে এলেন সেক্রেটারি।

—আপনি?

সেক্রেটারি বললেন—য়ুনিভার্সিটির একটা চিঠি পেলাম জরুরী, এই দেখো—তাই তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ ছিল—

কমলা দত্ত বললে—বলুন—

সেক্রেটারি বললেন—এক মিনিটে তো সব বলা হবে না আর স্টেশনের প্ল্যাটফরমেও হয় না সে-সব কথা, অনেক কাজও ছিল—

কমলা দত্ত বললে—তা হলে ইস্কুলেই চলুন—নয় তো আপনার কাছারি-ঘরে?

রামমোহন সেন বললেন—ইলেকশন সম্বন্ধেও তোমার সঙ্গে কথা ছিল অনেক, সদয়বাবুর নমিনেশন পেপার আমি ক্যান্সেল করবার ব্যবস্থা করেছি—

তারপর একটু থেমে বললেন—আমাদের সেই চিঠির উত্তরে এতদিন পরে য়ুনিভার্সিটি কী বলছে জানো···

কালোর-মা ততক্ষণে গাড়ি ডেকে এনেছে। কথা বলতে বলতে কমলা দত্তকে গাড়িতে তুলে নিলেন সেক্রেটারি।

আর ওদিকে কলকাতার ট্রেনটা তখন জুবিলী ব্রিজের ওপর দিয়ে গুম্ গুম্ শব্দ করে ছুটে চলেছে!

গাড়িতে আগে উঠলো কমলা দত্ত। তারপর কালোর-মাকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করলেন রামমোহন সেন। তারপর নিজে উঠলেন। উঠে দরজা জানলা ভালো করে বন্ধ করে দিলেন। গাড়ি চলতে শুরু করেছে কিন্তু গাড়ির চাকার শব্দ ছাপিয়ে তখনও ট্রেনের শব্দ কানে আসছে। কলকাতার ট্রেনটা তখনও হু হু করে কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে।

সেক্রেটারি বললেন—তুমি বোধহয় শোননি কমিটী তোমার মাইনে

আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে—

কমলা দত্ত শুধু চেয়ে রইল মুখের দিকে। কিছু উত্তর দিলে না।

সেক্রেটারি বললেন—আমরা সবাই ঠিক করেছি তোমার যা কাজ তাতে তোমাকে বড় কম মাইনে দেওয়া হয়—

কমলা দত্ত তবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল সেক্রেটারির মুখের দিকে।

সেক্রেটারি বললেন—ভাবছি তোমাদের হোস্টেলের বাড়িটা বড় ছোট, পাশে আর একটা বড় বাড়ি করতে হবে—আজকাল স্টাফ বাড়ছে, আর ছাত্রীসংখ্যাও বাড়ছে—কমিটির সামনের মিটিং-এ কথাটা তুলবো আমি—

কমলা দত্ত হঠাৎ কথা বলে উঠলো। বললে—একটু জল আছে এখানে?

—জল?

শুধু কালোর-মা-ই নয়, সেক্রেটারিও অবাক হয়ে গেলেন। বললেন জল! জল তেষ্টা পেয়েছে? জল খাবে?

কমলা দত্ত বললে—না—

—তবে?

কমলা দত্ত আবার বললে—একটু জল দিন না—

আর কেবল কমলা দত্তর মনে হতে লাগলো ট্রেনটা তার মাথার ওপর দিয়ে যেন গড় গড় করে গড়িয়ে যাচ্ছে। এক-একটা চাকা গড়িয়ে যায় আর তার মাথাটা এক মুহূর্তে গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে তার মৃত্যু হচ্ছে। পলে পলে তার অপমৃত্যু। এর থেকে তার আর মুক্তি নেই।

আবার জিজ্ঞেস করলেন সেক্রেটারি—জল কী হবে?

কিন্তু কমলা দত্তর মনে হতে লাগলো···একটা মোটর গাড়ি···রাঙা জ্যাঠাইমা···বড় সুখ ওদের···তেল নুন মশলার সংসার তোমার জন্যে নয়, আমরা সেবা করতে এসেছি···দেখ, মা কী সুখে আছি দেখ, সকাল থেকে এক বাটি চা-ও কেউ দিলে না···ওঁকে বলে ভার্জিন মেরী, গুরু-মা

···সাজবি বৈকি, সাজবি বৈকি মা, মেয়েমানুষের গয়না না পরলে কি মানায়···তোমাকে ভালোর জন্যেই বলছি সুকুমারী ওতে মঙ্গল নেই, কল্যাণ নেই···ওর মিথুন লগ্নে জন্ম, কপালে সুখ নেই ওর···শনিযুক্ত রয়েছে যে, আমি কী করবো···সারাদিন কী গল্প তোরা করিস রে, কী এত তাদের গল্প···না আপনি বুঝিয়ে বলুন, যদি কখনও···আপনি স্ত্রী হোন, মা হোন, বোন হোন, মেয়েমানুষ হোন—আপনার জন্যেই এই স্কুল, কলেজ, ডিগ্রি আর ওই পানু মানু ভানু, ওদের জন্যে বর—ওদের জন্যে ছেলেমেয়ে···ওদের জন্যে কুলাচার···বড় কষ্ট হয়···ওই হলেন সিস্টার নিবেদিতা, নাইটিঙ্গেল, আর ওই কমলা দত্ত—ওই যে···

সেক্রেটারি দেখলেন কমলা দত্ত যেন বিড় বিড় করে কী সব বকছে আপন মনে।

আবার জিজ্ঞেস করলেন—জল কী হবে কমলা?

গাড়ির চাকায় ধাক্কা লেগে সমস্ত মাথাটা তখন রক্তে ভেসে গিয়েছে। হাতময় রক্ত! কী কাণ্ড! লোকে কী বলবে!

সেক্রেটারি বললেন—জল কী হবে তোমার কমলা?

কমলা দত্ত বললে—জল না হলে পরিষ্কার হবে কী করে?

কমলা দত্ত তখনও ভাবছে···আত্মোৎসর্গ বানান করো তো, বেশ বেশ ···কমলা দত্ত আমাকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল···মনে করবার মতো ঘটনা আপনার জীবনে কি কিছুই ঘটেনি···মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে কী করেন···আপনি খাঁচার পাখী, আবার বনের পাখী হোন না, ও লেখাটা থাক, আপনি এক মুহূর্তের জন্যেও মেয়েমানুষ হয়েছিলেন ও তার সাক্ষী হয়ে থাক···

সেক্রেটারি তখনও কিছু বুঝতে পারছেন না। কালোর-মাও যেন হতবাক হয়ে গিয়েছে। কমলা দত্তকে ধরে বসে আছে সে, যেন না ধরলে পড়ে যাবেন দিদিমণি! গাড়ি তখনও গড় গড় করে গড়িয়ে চলেছে।

সেক্রেটারি বললেন—কী হলো তোমার কমলা?

কমলা দত্ত বললে—একটু জল দিন না—

—জল? জল কী করবে? খাবে?

কমলা দত্ত বললে—না।

—তবে ?

—হাতটা ধোব—

সেক্রেটারি কিছু বুঝতে পারলেন না। বললেন—হাত ধোবে কেন ? হাতে কী লেগেছে ?

কমলা দত্ত বললে—রক্ত !

আদিনাথ থামলো। বললে তা আমি তখন কমলা দত্তর চিঠি পেয়ে হাওড়া স্টেশনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। একটার পর একটা ট্রেন এসে চলে যায়—কমলা দত্তর দেখা নেই। তখন এসব খবর পাইনি। পরে সব শুনলাম—কমলা দত্তকে নাকি সেক্রেটারি আটকে রেখেছেন।

তারপর একটু থেমে বললে—এর পর যখনই আমাদের ছেলে-মেয়ে হয়েছে, সুকুমারী প্রত্যেকবার কমলাদিকে চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করেছে। কমলা দত্ত কখনও বা কয়েকটা টাকা, কখনও বা একটা গয়না পাঠিয়ে দিয়েছে ছেলে-মেয়েদের নাম করে করে। আমিও অনেকবার ভেবেছি একবার যাই। দেখা করে আসি গিয়ে কমলা দত্তর সঙ্গে। কিংবা গীর্জায় গিয়ে দেখে আসি সেই চাতালের সামনে দেয়ালের ওপর কমলা দত্তর হাতের লেখা আমার নামটা তখনও তেমনি স্পষ্ট আছে কি না। কিন্তু যাওয়া আর আমার হয়ে ওঠেনি। আর তারপর আস্তে-আস্তে আমার ব্যবসাও বাড়লো। আর হয়তো মনটাও বদলে গেলো বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে। কমলা দত্তর প্রসঙ্গ আস্তে-আস্তে ক্রমে ভুলেই গেলাম বলতে গেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আর ইস্কুল ?

আদিনাথ বললে—বলেছি তো, সে-ইস্কুল এখন কলেজও হয়েছে—কমলা দত্ত আরো তিনটে সাবজেক্টে এম-এ পাশ করেছে—কলেজের লেডি প্রিন্সিপাল হয়েছে। মোটকথা অনেক কিছু ঘটনাই ঘটে গিয়েছে

ইতিমধ্যে।

—তারপর?

—তারপর আর অনেকদিন কোনও খবর জানতাম না। কত বছর তো আসামের জঙ্গলে-জঙ্গলেই কেটে গেল। ব্যবসা নিয়েই মেতে ছিলাম, যৌবনের সেই চোখ দুটোই একদিন বদলে গেল। তার ওপর চশমা নিয়ে এখন তো রীতিমতো বুড়োই হয়ে গেলাম বলতে পারো। মেয়ের বিয়ে দেবারই সময় হয়ে এল ভাই। শুধু মাঝখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কাছাড়ে যেতে-যেতে একবার ট্রেনে একটুখানি আলাপ হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে শুনলাম তিনি নাকি হুগলীর লোক। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—হুগলী ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস কমলা দত্তকে চেনেন?

তিনি চিনতে পারেননি।

তারপর জিজ্ঞেস করেছিলাম—রামমোহন সেন? তাঁকে চেনেন?

রামমোহন সেনকে চিনলেন তিনি। ওদিকে তাঁর খুব নাম-ডাক। বললেন—তিনি তো মস্ত দাতা লোক মশাই—খবরের কাগজেও তাঁর নাম তো মাঝে-মাঝে বেরোয়—

কমলা দত্ত সম্বন্ধে বলতে গেলে সেই আমার শেষ খবর শোনা। কিন্তু তারপর বছর দুই আগে কমলা দত্তর কাছ থেকে হঠাৎ একটা চিঠি পাই। আমি তখন ডুয়ার্সে। চিঠিখানা আমার আপিসের ঠিকানায় লেখা। দশটা ঠিকানায় ঘুরে ঘুরে আমার কাছে সে চিঠি আসতে প্রায় একমাস সময় লেগেছিল। কমলা দত্ত সে-চিঠিতে একটা সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছিল আমাকে। আমার একটা ছেলেকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করতে চায় সে।

কমলা দত্ত লিখেছিল—জীবনে অনেক স্বপ্ন অনেক কল্পনা ছিল, সব স্বপ্ন কখনও কারো সফল হয় না, তবু বলতে পারি আমার সাধ কিছুটা পূর্ণ হয়েছে। আজ আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আদিনাথবাবু। আমার এই বয়েসে একটা অবলম্বন-স্বরূপ আপনার একটা ছেলেকে আমি লালন-পালন করতে চাই—দত্তক হিসেবে, আমার নিজের আদর্শমতো তাকে আমি মানুষ করবো···ইত্যাদি ইত্যাদি···

উত্তরে আমি লিখেছিলাম—আমি শীগ্‌গিরই কলকাতায় যাচ্ছি, গিয়ে তার ব্যবস্থা করবো।

কিন্তু কলকাতায়ও ওই বছর দু-একের মধ্যে আর আসা হয়নি। নানা কাজে একেবারে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

তারপর একটু থেমে আদিনাথ বললে—তা এতদিন এসেছি কলকাতায় অথচ সে কথা অমার মনেই ছিল না, আজ গল্প করতে করতে হঠাৎ আবার সব মনে পড়ে গেল···তা আজ ভাবছি দুপুরের ট্রেনে একবার যাবো কমলা দত্তর সঙ্গে দেখা করতে—ব্যাণ্ডেলে।

তারপর কী জানি কী ভেবে বললে—যাবি তুই আমার সঙ্গে? চল না কমলা দত্তকে দেখে আসবি!

কী জানি কমলা দত্তর গল্প শোনবার পর আমারও কেমন যেন তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হলো। আজকের কমলা দত্তকে দেখে যদি সেদিনের কমলা দত্তর কিছুমাত্র আভাসও পাই!

বললাম—যাবো—

এতদিন পরে কমলা দত্তর গল্প লিখতে বসে আজ বারে বারে যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। এ-গল্প আগে অনেকবার চেষ্টা করেও লিখতে পারিনি। দু-এক লাইন লেখবার পরেই থামতে হয়েছে। লেখা লাইনগুলোও কেটে ফেলেছি। তারপর ক্রমে একদিন কমলা দত্তর প্রসঙ্গটা ভুলেই গিয়েছিলাম বলতে গেলে।

কিন্তু হঠাৎ আবার সেদিন মনে পড়ে গেল।

মনে পড়ার একটা কারণও ঘটলো।

গল্প লিখলে-লিখতে আজ কেবল সেই কথাটাই বারবার ভাবছি।

ঘটনাচক্রে কলকাতার এক বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সভায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সেদিন।

হঠাৎ সামনে নজর পড়তেই দেখি সভাপতির আসনে বসে আছেন রামমোহন সেন। পাশের ভদ্রলোকটিও বললেন—ওঁরই নাম রামমোহন

সেন। আদিনাথের সেই ধীরোদাত্ত নায়ক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অনেকক্ষণ দেখতে লাগলাম। কী প্রশান্ত শ্রী! বয়েস হয়েছে বটে কিন্তু স্বাস্থ্যটি অটুট রেখেছেন। মাথায় কাঁচা পাকা চুল পরিপাটি করে সাজানো। কাঁধের চাদরটি বিন্যস্তভাবে পাট করা। কোঁচানো ধুতি, পাঞ্জাবি। আর তাঁর আশেপাশে সামনে-পেছনে অসংখ্য মহিলার ভিড়।

সঙ্গে-সঙ্গে আবার পুরনো কথা সব মনে পড়তে লাগলো। মনে পড়লো আদিনাথের কথা, সুকুমারীর কথা। আদিনাথ ব্যবসা করে এখন আরো ধনী হয়েছে। বাড়ি করেছে, গাড়ি করেছে। সুকুমারী সুগৃহিণী হয়েছে। একদিন বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল আদিনাথ, এখন আবার সংসারে তাদের মিল হয়েছে।

রামমোহন সেনমশাই তখন গম্ভীর ভাষায় তাঁর বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন।

বলছেন—পাড়ায়-পাড়ায় আমাদের এমনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, গ্রামে-গ্রামে এমনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এখানে আমরা সবাই সেবা করতে এসেছি, ছাত্রীদের সেবা, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা। এই মানুষের সংসারে আমরা অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছি। বিধাতার এত বড় দানকে, এত বড় আয়োজনকে আমরা আমাদের ব্যর্থতা দিয়ে কখনও উপহাস করবো না। মানুষের যজ্ঞ-আয়োজনকে দূরে ঠেলে ফেলে নুন-তেল-মশলার সংসারের স্নিগ্ধ-বিশ্রামের মধ্যে ঘুমোবার চেষ্টা করবো না—

আমার মনে পড়লো অনেক দিন আগের একটা কথা। দুপুরের ট্রেন ধরে সেদিনই দু'জনে ব্যাণ্ডেলে রওনা হয়েছিলাম।

গিয়ে বিয়োগান্ত দৃশ্যই দেখবো এই আশঙ্কাই করেছিলাম অবশ্য। কিন্তু তা যে এমন হবে ভাবিনি। ভেবেছিলাম যদি কোনওদিন কমলা দত্তকে নিয়ে গল্প লিখি তো সেদিন সে-গল্পতে এই কথাটাই বলবো যে, আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি চিরন্তন নারী রয়েছে। পুরুষ ও নারী দু'জনের অন্তরের মধ্যেই রয়েছে। সে বলছে—আমি জ্ঞান মানি না, পরমার্থ মানি না, খ্যাতি মানি না, প্রতিপত্তি মানি না। বিশ্ব-চরা-

চরের সমস্ত কিছু সঞ্চয়কে পরিত্যাগ করে আমি যা চাই তা হলো পরমামৃত। সে বলছে—খ্যাতি, প্রতিপত্তি যথেষ্ট পেয়েছি, ওতে কেবল দূরত্বই সৃষ্টি করে, অর্থসম্পদও চাই না কারণ ওতে কেবল বিচ্ছিন্নতাই আনে—আমি শুধু চাই প্রেম। কারণ জ্ঞান—সে তো কেবল বিচারই করে, কিন্তু প্রেম যে জোড়া লাগায়। যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে মৈত্রেয়ী তো ধন-সম্পত্তি চাননি, চেয়েছিলেন প্রেমেরই সেই পরম-মন্ত্র! কিন্তু এ প্রেমের এক কণাও যে পেলে না, যার জীবনে প্রেমের পরম-লগ্ন এল না, যাকে জোর করে পরমামৃত থেকে বঞ্চিত করে রাখা হলো, তার নামই তো কমলা দত্ত!

এই কথাটাই নানাভাবে গল্পের মধ্যে প্রকাশ করবো ভেবেছিলাম। কিন্তু গিয়ে চোখের সামনে যা দেখেছিলাম তারপর আর গল্প লেখার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ব্যাণ্ডেল স্টেশনের পাশে সেই অশথ গাছটা সেদিনও তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু ইস্কুলের নাম করাতে গাড়োয়ানরা বললে—ইস্কুল তো কবে উঠে গিয়েছে হুজুর—

তবু গেলাম। কিন্তু ইস্কুলের সামনে গিয়ে ভেতরে কি আশে-পাশে কোথাও জন-প্রাণীর কোনো সাড়া-শব্দও পাওয়া গেল না। আদিনাথ বললে—চল্, সেক্রেটারির বাড়ির দিকে যাই, যেখানে গেলে হয়তো কমলা দত্তর কিছু খোঁজ-খবর পাওয়া যেতে পারে।

সেক্রেটারির ছোট ছেলে বেরিয়ে এলেন। শিশুমোহন সেন। বললেন—কমলাদি? কমলা দত্ত! তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন আপনারা? তারপর কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন—আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

তারপর আমাদের কথা শুনে বললেন—আচ্ছা, আসুন আপনারা আমরা সঙ্গে—

ইস্কুলের সামনে নিয়ে এসে সামনের সদর-দরজার তালা খুলে ভদ্র-

লোক আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। ফাকা বাড়ি। ভেতরে আবর্জনা, গাছ-পালা জন্মেছে। কোথাও জনমানবের কোন সাড়া-শব্দও নেই। তারপর ভেতরে ঢুকে আর একটা ঘরের দরজা খুললেন। বললেন—ওই যে—ওই দেখুন—

ভালো করে চেয়ে দেখলাম। মনে হলো জানলা-দরজা বন্ধ ঘরের ভেতরে আবছায়ার মধ্যে টেবিলের সামনে একটা মূর্তি যেন নিশ্চল হয়ে বসে আছে। আমাদের দেখেই উঠে সামনে এগিয়ে এল। মাথার চুল অল্প অল্প পেকে গিয়েছে। অনেকদিন চুলে তেল পড়েনি।

আদিনাথ চুপি-চুপি কানে-কানে বললে—কমলা দত্ত!

কমলা দত্ত ততক্ষণে আমাদের দেখে এগিয়ে এসেছে। খানিকক্ষণ আমাদের মুখের কাছে মুখ এনে কী যেন দেখলে ভালো করে। তারপর বললে—আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন?

আদিনাথ বললে—হ্যাঁ।

কমলা দত্ত বললে—আমাদের কলেজ দেখতে এসেছেন তো? ভালোই হয়েছে, আপনাদের জন্যেই আমি বসেছিলুম—তা—আসুন—আসুন আমার সঙ্গে—

তারপর আমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাইরে উঠোনে দাঁড়ালো। উঠোনেও কেউ নেই। ইট চুন সুরকির স্তূপ পড়ে আছে আশে পাশে। কয়েকটা আগাছা জন্মে জায়গাটাকে একেবারে ভয়াবহ করে তুলছে। কমলা দত্তর দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম। নিষ্প্রাণ ক্রূর দৃষ্টি দু' চোখে—মুখে অস্বাভাবিক রুক্ষতা, সর্বাঙ্গে কর্কশ কৃশ কাঠিন্য। সেখানে দাঁড়িয়ে কমলা দত্তর সেই পাথরের মূর্তি দেখে যেন ভয় করতে লাগলো আমার।

কমলা দত্ত সামনে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওই দেখুন—ওই যে পুবদিকে খোলা জায়গাটা দেখছেন ওইখানে হবে আমাদের ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরী, আর তার পাশেই হবে ফিজিক্যাল কাল-চারের জিম্‌নাসিয়াম, আর এই সামনের খালি মাঠটা দেখছেন, ওইটেতে হবে মস্ত একটা হল্—কোনও বিখ্যাত লোক এলে ওখানেই বক্তৃতার

ব্যবস্থা হবে—আর এখন এটা এমনি কলেজ রয়েছে বটে কিন্তু একদিন য়ুনিভার্সিটি করার ইচ্ছে আছে আমাদের সেক্রেটারির···আমাদের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করেছেন আপনারা ?

বলেই খানিকক্ষণ যেন কী বিড়বিড় করে বলতে লাগলো নিজের মনে। তারপরেই বললে—কুলাচার না হলে সিদ্ধি হয় না কি না—

অসংলগ্ন সব প্রলাপ ! ভয় করতে লাগলো !

বাইরে বেরিয়ে এসে সেক্রেটারির ছোট ছেলে বললেন—অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখানো হয়েছে। চিকিৎসার জন্যে বাইরেও পাঠানো হয়েছে কতবার, কিন্তু সব জায়গা থেকেই কমলাদিকে ফেরত দিয়েছে, বলে—বড় নাকি উৎপাত করে সেখানে, এখন তাই ইস্কুলেই ওকে রাখা হয়েছে, আর কালোর মাকেও রাখা হয়েছে দেখাশোনা করবার জন্যে—এখানে এই ইস্কুলের মধ্যে থাকলেই যেন তবু একটু শান্ত থাকে কমলাদি—তা ছাড়া···

আদিনাথ এত সব খবর কিছুই জানতো না। জিজ্ঞেস করলে—আপনার বাবা কোথায় ? ইস্কুলের সেক্রেটারি ?

ভদ্রলোক বললেন—বাবা আজকে একটা কাজে কলকাতায় গিয়েছেন, নানান কাজে তাঁকে প্রায়ই যেতে হয় কলকাতায়—তাঁর আসতে রাত্তির হবে—

আদিনাথ বললে—কিন্তু এ ইস্কুল বন্ধ হলো কেন ?

ভদ্রলোক বললেন—ইস্কুলের জন্যে বাবা তো প্রায় সর্বস্ব খরচ করেছেন—যতদিন কমলাদি ভালো ছিল, ততদিন ইস্কুল চালানো হয়েছে, তারপর যখন কমলাদি'র ওই রকম শরীর খারাপ হলো তখন আর ইস্কুল কে দেখবে বলুন—

আদিনাথ বললে—কিন্তু দু'বছর আগেও যে কমলা দত্তর কাছ থেকে এই চিঠি পেয়েছি দেখুন—

আদিনাথ পকেট থেকে সত্যি সত্যিই কমলা দত্তর পুরনো চিঠিটা বার করলে এবার।

ভদ্রলোক বললেন—দুবছর আগেও তো ইস্কুলটা চলছিল কি না—

তারপর ওর নিজেরই যে ওই রকম শরীর খারাপ হলো। তখন ইস্কুল বন্ধ না করে দিয়ে আর উপায় কী বলুন—

কমলা দত্ত ততক্ষণে আবার আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে নিঃশব্দে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে।

আমরাও বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোকও ধীরে-সুস্থে দরজায় তালা বন্ধ করে আমাদের সঙ্গে রাস্তায় এসে নামলেন।

রামমোহন সেন তখনও বলে চলেছেন—পৃথিবীতে আর যে যা করে করুক, আর যে যা ভাবে ভাবুক, আমরা এখানে বিশ্ববিধাতার কাছে শান্তি চাইতে আসিনি, আরাম চাইতে আসিনি। আমরা কল্যাণ চেয়েছি—কল্যাণ চাইলে দুঃখ কষ্টকে ভয় করলে তো চলবে না—কল্যাণ যে দুঃখের মুকুট পরেই উদয় হয় সংসারে···

বক্তৃতা একসময়ে থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর হাততালি। সে হাততালি যেন আর থামতে চায় না।

কিন্তু আমি হাততালি দিতে চেষ্টা করেও যেন হাততালি দিতে পারলাম না। আমার কেমন মনে হলো—এক কমলা দত্ত আজ যেন হাজার হাজার কমলা দত্ততে রূপান্তরিত হয়েছে। আমার তখন সেই জানলা দরজা বন্ধ ঘরের ভেতর কমলা দত্তর নিশ্চল পাথরের মূর্তিটা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মনে হলো—ও যেন উল্লাস-ধ্বনি নয়, আর্তনাদ! কাশিম খাঁর অত্যাচারে আজ হাজার হাজার ভার্জিন মেরী যেন একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলো চারিদিক থেকে।

—